অক্টোবর ২০০৫ ● দশ টাকা

আনন্দমেলা



শিবরাম চক্রবর্তীর বেদম হাসির গল্পের রঙিন কমিক্স (প্রথমাংশ)

মই নিয়ে হইচই

কমিক হিরো সুপারম্যান

জমজমাট তিনটি গল্প

কালিকাপুরের উল্কা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথম কিস্তি)

এ ছাড়া সমস্ত নিয়মিত বিভাগ



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com



Disney
Bodycare presents Disney range to satisfy kids inner desire and make them love what they wear. Designs one can easily relate to and love forever...
PREMIUM COMFORT
A disney collection that reflects the spirit, personality & playfulness for Kids.
Cheerful designs
Comfortable shapes
Attractive colours
Soft, skin-friendly fabrics
Breathable stickers.
Code: 902 & 901
Code: 903 & 904
MICKEY
Vests and briefs for boys and girls.
Code: PO 907 & 906
PRINCESS
Vest & Brief Sets for Girls
Code: PO 905 & 906
POOH
Vests for boys and girls & Briefs for Boys
Collect FREE 3D Disney Character Cards
Bodycare
Comfort Forever...
Softer fit. Gentle feel.
Authorised Distributor: SHREE KRISHNA ENTERPRISES
195/1/1, IInd Floor, Mahatama Gandhi Road, Kolkata-700 007 (W.B.) Tel.: 22708853, 55252165
Mktd. by: BODYCARE INTERNATIONAL LTD.
163, Functional Industrial Estate, Patparganj,Delhi - 110092. Tel.: 011-22148607/08
Fax: 011-22158609 E-mail: bodycare@bodycareintl.com Website: www.bodycareintl.com
Code: 1278
BREATHABLE
LIGHT WEIGHT

আনন্দমেলা

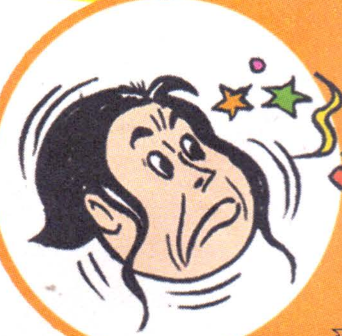
৩১ বর্ষ ৬ সংখ্যা আশ্বিন ১৪১২ অক্টোবর ২০০৫

কালিকাপুরের উল্কা ২৮ সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

ঝাড়খন্ডের কালিকাপুরের বংশানুক্রমিক রাজা সূর্যকান্তবাবুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল মানুদা আর ছ'জন—সুমে, নেরু, বাঘা, নন্তু, ভুতো আর পিতু। বিজনেসম্যান সন্দীপ শেঠি রাজাসাহেব মানে সূর্যকান্তবাবুর জমি কেনার জন্য তাঁকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে গেছেন। রাজাসাহেবের মেয়ে রানিকে গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচাল পিতু। মা-কালী নাকি বাগানবাড়ির মন্দির থেকে বেরিয়ে ভয়ংকরী মূর্তিতে নৈশপ্রহরীদের দেখা দিয়েছেন। তিনি নাকি রুষ্ট হয়েছেন! করঞ্জাক্ষবাবুর বাড়ির সামনের মাঠে চলছে ভিডিও-শো, ম্যাজিক আর সার্কাস। জমে উঠল রহস্য।

মই নিয়ে হইচই ৯



গল্প: শিবরাম চক্রবর্তী

সম্পূর্ণ কমিক্‌স (প্রথমাংশ)

সাতসকালে পিসেমশাই শিবরামকে বললেন, একটা মই নিয়ে শান্তালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তাকে। কীভাবে মই নিয়ে যাবে সে এতটা রাস্তা! ঠেলায় চাপিয়ে, না লরিতে করে, জিজ্ঞেস করতেই রেগে আগুন পিসেমশাই। মই নিয়ে বাসে চেপে শান্তালয়ে রওনা হল শিবরাম। মইয়ের চাপে যাত্রীরা জেরবার! কী হল তারপর?

ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

অন্যান্য পাতায়

প্রচ্ছদ: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

গল্প



খেলাধুলো



সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা।
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।





হ্যারিকে নিয়ে কুইজ়

জুলাই ও অগস্ট সংখ্যা 'আনন্দমেলা' পড়ে খুব ভাল লাগল। হ্যারি পটারের বই নিয়ে লেখা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। আরও ভাল লাগত, যদি হ্যারিকে নিয়ে একটি কুইজ় বিভাগ থাকত।

সুকন্যা বিশ্বাস, *নবম শ্রেণি*
নৈহাটি প্রফুল্ল সেন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

ছাপা হোক অরণ্যদেব কমিক্‌স

অগস্ট সংখ্যা 'আনন্দমেলা' পড়ে দারুণ লাগল। 'মরুভূমির অভিশাপ' এবং 'গা ছমছম' এক কথায় অনবদ্য। অরণ্যদেব কমিক্‌স ছাপা হলে আরও ভাল লাগবে।

অর্ক ঘোষাল, *চতুর্থ শ্রেণি*
কোচবিহার

টিনটিন কমিক্‌স চাই

'আনন্দমেলা'র কমিক্‌স আমার খুব ভাল লাগে। টিনটিনের কমিক্‌স ছাপা হলে আরও ভাল লাগবে। হাসির গল্প পড়তেও খুব ভাল লাগে। অ্যাডভেঞ্চারের গল্প ছাপা হলে ভাল হয়।

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, *হাবড়া, উঃ চব্বিশ পরগনা*

আরও গোয়েন্দা গল্প

'হলুদপুকুর ক্রিকেট আকাদেমি' পড়ে ভাল লাগল। ক্রিকেট নিয়ে এরকম আরও উপন্যাস 'আনন্দমেলা'য় দেখতে চাই। আরও বেশি গোয়েন্দা গল্প ও ভূতের গল্প 'আনন্দমেলা'য় ছাপলে ভাল লাগবে।

অয়নকুমার ঘোষ, *কলকাতা-৭০০ ০৮২*

চাই 'শঙ্কু কমিক্‌স'

জীবজন্তু নিয়ে লেখা আমার প্রিয় 'আনন্দমেলা'য় দেখতে চাই। এ ছাড়া প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে কমিক্‌স ছাপলে ভাল লাগবে। ঘরে বসে খেলার মতো কয়েকটি খেলার সন্ধান পেতে চাই আনন্দমেলায়।

রত্নদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সপ্তম শ্রেণি*
মিত্র ইনস্টিটিউশন (ভবানীপুর শাখা)

আরও বেশি বিজ্ঞানের লেখা

'আনন্দমেলা' পড়ি নিয়মিত। প্রতি সংখ্যায় যদি গল্পের সঙ্গে আরও বেশি ইতিহাস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে লেখা ছাপা হয়, তা হলে ভাল লাগবে।

সপ্তক কর্মকার
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, কৃষ্ণনগর

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার 'ই-মেল'-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

'আনন্দমেলা'র জবাব নেই

'আনন্দমেলা'য় প্রোফেসর শঙ্কুর কমিক্‌স ছাপা হলে খুব ভাল লাগবে। আনন্দমেলার পাতায় বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ায় আমরা বিভিন্ন বইয়ের খোঁজখবর পাচ্ছি আনন্দমেলার জবাব নেই।

প্রসেনজিৎ হালদার, *নাটিডাঙা, নদিয়া*

রূপকথার কেলেঙ্কারি

এবারের 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা' হাতে পেলাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি অপ্রকাশিত গল্প ছাপা হয়েছে। নাম, 'রূপকথার কেলেঙ্কারি'। গল্পটি আমার ছেলেবেলায়, ১৯৬৫-৬৬ সালে 'পরিরা কেন আসে না' বইয়ে পড়েছি। এমনকী, ১২-১৩ বছর আগে আমার মেয়েকে ওই বইটি কিনেও দিই (সেটি যদিও অন্য সংস্করণ)। আপনাদের দপ্তরে গল্পটির প্রতিলিপিও পাঠালাম। আমি 'আনন্দমেলা' পত্রিকা প্রথম সংখ্যা থেকে পড়ে আসছি। আমার পরিবারের সকলেই এই পত্রিকার অনুরাগী। বাংলা ভাষায় এটিই শ্রেষ্ঠ কিশোর পত্রিকা। তাই এই ধরনের ত্রুটি পীড়া দেয়।

অভিজিৎ দত্ত, *গোলবাগান, কোচবিহার*

গল্প সংগ্রাহকের উত্তর: 'পূজাবির্ষিকী আনন্দমেলা'য় 'রূপকথার কেলেঙ্কারি' গল্পটি এক প্রকাশককে স্বত্ব বিক্রি করে স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্রই দিয়েছিলেন। সঙ্গে মূল পাণ্ডুলিপিও দিয়েছিলেন। আমার প্রতিবেদনে সেকথা উল্লেখও করেছি। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে লেখকই সেই গল্পটি অন্য প্রকাশককে প্রকাশের জন্য সম্ভবত লেখাটির প্রতিলিপিসহ দিয়েছিলেন। যা আমার অজ্ঞাত ছিল। এর জন্য দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।

বারিদবরণ ঘোষ, *বালি, হাওড়া-৭১১ ২০১*



‘পুজোর কবিতা’ প্রতিযোগিতার ফলাফল।

১

পেঁজা তুলোর পাখনা মেলে
পায়রা এসে বলে—
মায়ের গজে ঠাঁই হল না
অসুর হেঁটে চলে।
হঠাৎ পথে ফুটল কাঁটা
দাদা রেগে কাঁই।
মায়ের এখন মহাদেবকে
ই-মেল করা চাই।

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি
বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন
কলকাতা

২

সোনায় মোড়া রোদের নৌকো
ভাসিয়ে অজানায়
শরৎ মাঝি বলছে হেঁকে
আয় কে যাবি আয়।
এমনি দিনে ভাল্লাগে না
রুটিন চার দেয়াল
ইচ্ছে করে পালিয়ে বেড়াই
শিলং থেকে সেনেগাল।

ঋতজা ঠাকুর
অষ্টম শ্রেণি
শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা
বিদ্যালয়, কলকাতা

৩

রোদে সোনার রং ধরেছে,
উড়ছে প্রজাপতি।
কৈলাসে ওই তৈরি হলেন
লক্ষ্মী, সরস্বতী।
নতুন জামা, নতুন জুতো
সবার মুখে হাসি,
ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে, এসো
আনন্দেতে ভাসি।

কৌশাম্বী মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ শ্রেণি
ডি এ ভি পাবলিক স্কুল
রূপনারায়ণপুর
বর্ধমান

পাঠকের পাতা

আগামী সংখ্যার বিষয়

অক্টোবর মাস মানেই পুজোর মাস। রংবেরঙের, নানারকমের দুর্গাঠাকুর। কেমন হত যদি এই সব অসুরদলনীদের হাতে থাকত একটা করে মোবাইল ফোন। এমনই এক মজাদার কল্পনা গদ্যে লিখে পাঠাও আমাদের ১০ লাইনের মধ্যে। এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় ‘দুর্গাঠাকুরদের সকলকে একটা করে মোবাইল ফোন দেওয়া হোক’। ক্লাস ফোর থেকে এইটের পড়ুয়ারা প্রধানশিক্ষক-প্রত্যয়িত মৌলিক লেখা পাঠাও। সঙ্গে পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও টেলিফোন নম্বর পাঠাতে হবে। বিজেতারা পাবে দারুণ পুরস্কার। ২০ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে লেখাটি পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়:

পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০১

আরও যাদের কবিতা ভাল হয়েছে

দিঘির জলে শাপলা শালুক
সাতসকালে জাগে—
ভোরের হাওয়া দোল দিয়ে যায়
সূয্যি ওঠার আগে।
দূর মাঠের ওই সবুজ থেকে
পুজোর খবর আসে,
নীলের বুকে সাদা মেঘে
দুগ্গাঠাকুর হাসে।

স্বপ্নিল মালাকর
অষ্টম শ্রেণি
বারাসাত প্যারীচরণ সরকার
রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়
কলকাতা

বলছে, তোরা আয় না ভাই
আয় না তাড়াতাড়ি
ক'দিন পরেই মা আমাদের
মর্ত্যে দেবেন পাড়ি।
তাই তো বলি নতুন করে
মনের মতো সাজ না
মাকে আমরা করব বরণ
বাজিয়ে নানান বাজনা।

চিত্রাঙ্গদা মণ্ডল
চতুর্থ শ্রেণি
এস সি মেমোরিয়াল স্কুল
চাকদহ, নদিয়া

ওই যে বাজে পুজোর সানাই
বাতাসে তার সুর,
খুশির খেয়ায় মন যেতে চায়
কোন সে অচিনপুর।
দুগ্গাদেবী ওই যে এলেন—
পাড়ায় পাড়ায় ধুম,
বইয়ের পাতায় মন বসে না
চোখজোড়া নির্ঘুম।

উষসী কর
পঞ্চম শ্রেণি
বারাসাত কালীকৃষ্ণ বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়
উত্তর চব্বিশ পরগনা



১৯৩৮ সালে প্রথম বেরোয় সুপারম্যান কমিক্স। তারপর রেডিও, টেলিভিশন এবং সিনেমায় অনেক বার দেখা গেছে সুপারম্যানকে। অসম্ভব জনপ্রিয় এই কমিক চরিত্র নিয়ে লিখেছেন অভিজিৎ সুকুল

ফিরে আসছে

স্রষ্টা: জেরি সিগেল আর জো শাটার। তবে ১৯৮৬ সাল থেকে নতুন রূপে যে সুপারম্যানের আবির্ভাব হয়েছে, তার পিছনে আছেন জন বায়ান।

আসল নাম: কাল-এল। সুপারম্যান আসলে সৌর জগতের ক্রিপটন নামে একটি গ্রহের বাসিন্দা। বাবা জের-এল সেখানকার বিজ্ঞানী। ক্রিপটন ধ্বংস হয়ে যাবে জানতে পেরে জোর-এল আর মা লারা সুপারম্যানকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। এখানে কানসায়ের স্মলভিল শহরের জোনাথান আর মার্থার কাছে বড় হতে থাকেন তিনি। পৃথিবীতে তাঁর নাম হয় ক্লার্ক জোসেফ কেন্ট। এ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি নাম আছে সুপারম্যানের। যেমন, 'দ্য ম্যান অফ স্টিল', 'দ্য লাস্ট সন অফ ক্রিপটন', 'ম্যান অফ টুমরো' ইত্যাদি।

উচ্চতা: ছ' ফুট তিন ইঞ্চি।

পোশাকআশাক: সুপারম্যানের বিখ্যাত নীল কস্টিউমের কথা তো সকলেরই জানা। বুকে 'S' অক্ষর লেখা এই কস্টিউম তৈরি করেছিলেন তাঁর মা মার্থা-কেন্ট।

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৮ সালের জুন মাসে অ্যাকশন কমিক্সে প্রথম বেরোয় সুপারম্যান। সুপারম্যানের প্রথম গল্পটি ছিল ১৩ পাতার। নতুন রূপে সুপারম্যানকে দেখা গেছে ১৯৮৬ সাল থেকে।

২০০৬ সালে 'সুপারম্যান রিটার্নস' চলচ্চিত্রে অভিনয় করবেন ব্র্যান্ডন রথ

সিনেমায় সুপারম্যান: রেডিও, টেলিভিশন এবং সিনেমায় বহুবার দেখা গেছে সুপারম্যানকে। সুপারম্যানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জর্জ রিভ্স, ক্রিস্টোফার রিভ এবং ডিন কেন। ১৯৪৮ সালে প্রথম সুপারম্যান সিরিয়াল আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয়টি ১৯৫০ সালে। ১৯৫১ সালে 'সুপারম্যান অ্যান্ড দ্য মোলম্যান' ফিচার ফিল্মে অভিনয় করেন জর্জ রিভস। ১৯৭৮-এ 'সুপারম্যান: দ্য মুভি' তে ছিলেন মার্লোন ব্যান্ডো,



'সুপারম্যান টু' চলচ্চিত্রে ক্রিস্টোফার রিভ্‌স

সুপারম্যান

জেনি হ্যাকম্যান এবং ক্রিস্টোফার রিভ। ১৯৮০ সালে মুক্তি পেল 'সুপারম্যান টু', 'সুপারম্যান থ্রি' এবং 'সুপারম্যান ফোর: দ্য কোয়েস্ট ফর পিস।' এই তিনটি ফিল্মেই অভিনয় করেছেন ক্রিস্টোফার রিভ্‌স।

পেশা: 'ডেইলি প্ল্যানেট' নামে এক খবরের কাগজে সাংবাদিকের কাজ করেন সুপারম্যান।

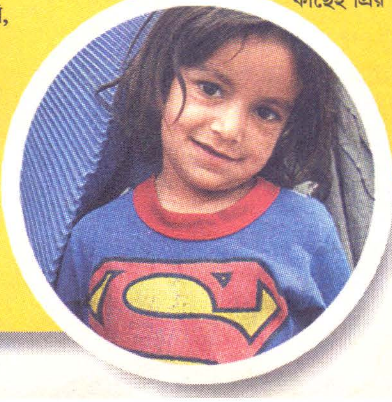
সঙ্গীরা: বান্ধবী লই লেন (এঁর সঙ্গে নব্বইয়ের দশকে সুপারম্যানের বিয়ে হয়), জিমি ওলসেন (সঙ্গী ফোটোগ্রাফার), পেরি হোয়াইট ('ডেলি প্ল্যানেট'-এর সম্পাদক), ক্রিপটো (পোষা কুকুর)।

শক্তি: সুপারম্যানের শক্তির তালিকাটি বেশ বড়সড়। ওড়ার ক্ষমতা ছাড়াও সুপারম্যানের রয়েছে এক্স-রে ভিশন, টেলিস্কোপিক ভিশন এবং হিট ভিশন। মনঃসংযোগ করে ধাতু গলিয়ে দিতে পারে এই হিট ভিশন। এ-ছাড়াও তাঁর নিশ্বাস হারিকেন ঝড়ের মতো শক্তিশালী। প্রখর শ্রবণশক্তি (একমাত্র কুকুরের সঙ্গে তুলনীয়), সুপার-স্পিড, সুপার-শক্তি সুপারম্যানের অন্যান্য ক্ষমতা। অন্যের গলা নকল করার ক্ষমতাও (সুপার ভয়েস) রয়েছে এই চরিত্রটির। ক্রিপটন গ্রহের বাসিন্দা হওয়ায় সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি অনেক উন্নত।

দুর্বলতা: অন্য কাউকে রক্ত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করার ক্ষমতা সুপারম্যানের নেই। তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করাও এক দুরূহ ব্যাপার। সিসার উপর কোনওভাবে কাজ করে না সুপারম্যানের শক্তি।

শত্রুরা: লেক্স লুথার (কুচক্রী বিজ্ঞানী, পরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন), ডার্কসিড(Darkseid), বিজারো (সুপারম্যানের ছদ্মবেশ নিয়ে ক্ষতি করে বেড়ায়), মেটালো, ব্রেনিয়াক, প্যারাসাইট, ইন্টারগ্যাং, ডুমস্‌ডে, টয়ম্যান, সাইবর্গ সুপারম্যান, গগ, ইম্পোরিয়েক্স প্রমুখ।

সুপারম্যানকে নিয়ে নতুন ছবি: **শুরু হতে চলেছে সুপারম্যানকে নিয়ে নতুন ছবি,** 'সুপারম্যান রিটার্নস'। ২০০৬ সালে সুপারম্যানকে দেখা যাবে এই ফিল্মে। ব্রায়ান সিঙ্গার-এর পরিচালনায় এই ফিল্মে সুপারম্যানের ভূমিকায় থাকবেন ব্র্যান্ডন রথ।



সুপারম্যান টি-শার্ট সারা পৃথিবীর ছোটদের কাছেই প্রিয়

চিরদিনের পূজাবার্ষিকী

"আমার ঘটনাটা কেউ বিশ্বাস করবে বলে বিশ্বাস হয় না। না করুক তাতে কিছু আসে যায় না। নিজে চোখে না দেখা অবধি অনেকেই অনেক কিছু বিশ্বাস করে না। যেমন ভূত।" —এভাবেই সত্যজিৎ রায় শুরু করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গল্প 'প্রোফেসর হিজিবিজবিজ'। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৮ সালে আনন্দমেলা প্রথম পূজাবার্ষিকীতে।

"এবার আমার হাতের পুঁটলিটা তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললাম, 'রক্ষা পাবার একটা উপায় তবু করে দিয়ে যাচ্ছি। কাল যে মাছ দেখে নাক সিঁটকেছিলে সেই মাছই ও থলিতে আছে। ওর গা টিপে দুধের মতো যে রস বেরোয়, তাই একটু করে চারধারের জলে মিশিয়ে দিয়ো...। হাঙর খেদানো এই মাছের নামটাও মন্ত্রের মতো মনে রেখো। কাল প্রাণে বাঁচবার পর তোমার সাকরেদও এই মন্ত্র আমার কাছে শিখে তোমার মতো শয়তান সর্দারের সংস্রব চিরকালের মতো ছেড়ে গেছে। মন্তরটা ধীরে-ধীরে বলছি, ও মাছের গা টিপতে-টিপতে মুখস্থ করে ফেলো।—পার্দাচিরস মার্মোরেটস।'"



১৩৮২ সালের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই দুর্দান্ত গল্প 'গুল-ই ঘনাদা'।

এরকমই মনে রাখার মতো দুর্দান্ত ৫০টি গল্প নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৌলোমী সেনগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশ করেছে 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা গল্প সংকলন'। ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৩০টি পূজাবার্ষিকী ঘেঁটে নামী লেখকদের গল্পগুলো বেছে নিয়েছেন সম্পাদক।

বইটি থেকে পাঠকরা যাতে সেই সময়ের স্বাদ পেতে পারে, সেকথা মনে রেখে যে অলংকরণে সেজে গল্পগুলো ছাপা হয়েছিল পূজাবার্ষিকীতে, সেগুলোকেই অবিকল তুলে আনা হয়েছে। এতে বইটি হয়েছে আরও আকর্ষক।

বইটিতে যেমন আছে অ্যাডভেঞ্চার গল্প বা হাসির গল্প তেমনই আছে গা ছমছম করা ভূতের গল্প, রহস্য গল্প বা খেলা নিয়ে জমজমাট গল্পও। ছোটরা ঠিক যেমনটি চায়, গল্পগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে সেই নিরিখেই। আর বইটিকে তেমনভাবে সাজিয়েও দেওয়া হয়েছে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখজুড়নো সুন্দর প্রচ্ছদে। ছোটদের হাতে তুলে দেওয়ার মতো ঝকঝকে ছাপা প্রায় ৫০০ পাতার এক চিরদিনের পূজাবার্ষিকী।

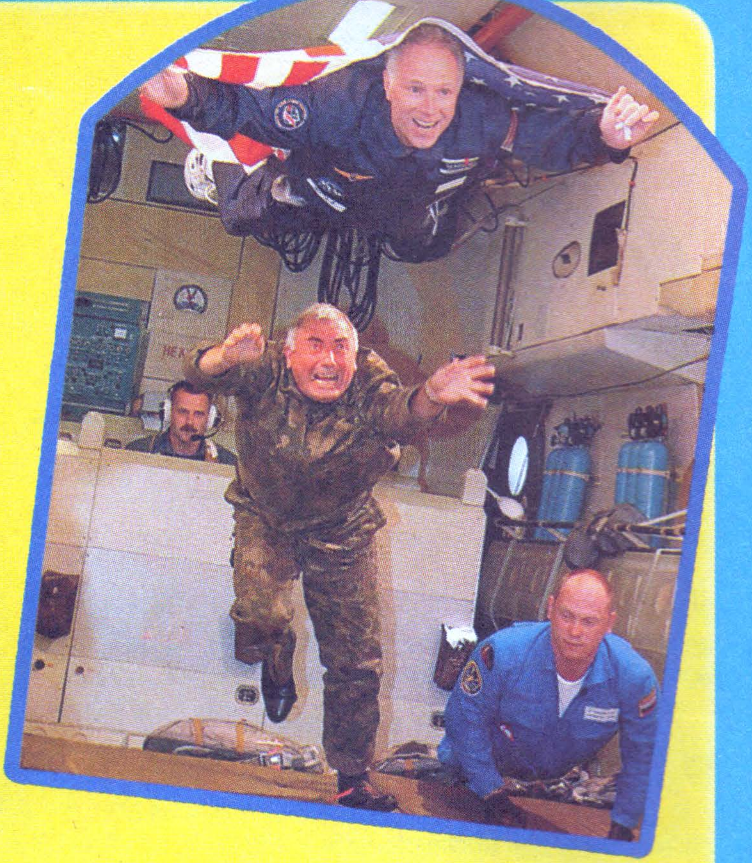
বইটি পাওয়া যাবে: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মানুষের জন্য কৃত্রিম ফুসফুস

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে চলেছেন ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ লন্ডন-এর বিজ্ঞানীরা। তাঁরা তৈরি করছেন কৃত্রিম ফুসফুস। মানুষের শরীরের নষ্ট হয়ে যাওয়া ফুসফুস ফেলে দিয়ে সেখানে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে ল্যাবরেটরিতে তৈরি এই কৃত্রিম ফুসফুস। মানুষের স্টেম সেলকে লাং সেলে রূপান্তরিত করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা (স্টেম সেল মানুষের শরীরের অন্যান্য সেলের জন্ম দেয়)। এর ফলেই কৃত্রিম ফুসফুস তৈরির পথে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন তাঁরা।

প্লাস্টিক স্পেসশিপ

মহাকাশ অভিযানে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার জন্য প্লাস্টিকের বিকল্প আর কিছু নেই। এমনটাই অভিমত বিজ্ঞানীদের। পলিথিনই এবার হবে আগামী দিনের স্পেসশিপ তৈরির প্রধান উপাদান। মহাকাশে রেডিয়েশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর বিকল্প নাকি আর কিছু নেই! নাসার স্পেস রেডিয়েশন শিল্ডিং প্রোজেক্টের বিজ্ঞানীরা পলিথিন দিয়ে একটি নতুন ধাতু তৈরি করেছেন, নাম আর এক্স এফ ওয়ান। অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও হাল্কা অথচ কঠিন এই ধাতু কসমিক রে এবং সৌরঝড়ের হাত থেকে অন্যান্য ধাতুর চেয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি নিরাপত্তা দেবে। মঙ্গলে পাড়ি দিতে নাসার বিজ্ঞানীরা শিগগিরই এই ধাতু দিয়ে তৈরি করবেন স্পেসশিপ।



মহাকাশে বেড়াতে যাচ্ছেন গ্রেগরি ওলসেন

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন গ্রেগরি ওলসেন। এই প্রস্তুতি তাঁর স্বপ্নের যাত্রার জন্য। সয়ুজ স্পেসক্র্যাফট-এ চেপে 'ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন'-এ রওনা হওয়াই ছিল তাঁর এতদিনের স্বপ্ন। বিশ্বের তৃতীয় প্রাইভেট স্পেস টুরিস্ট তিনি, যিনি এই বিরল অভিজ্ঞতার সুযোগ পাচ্ছেন। ৬০ বছর বয়সি গ্রেগরি এর জন্য খরচ করেছেন দু' কোটি টাকা। তাঁর সঙ্গে থাকছেন দু'জন মহাকাশচারী, রাশিয়ার ভ্যালেরি টোকারেভ ও নাসার উইলিয়াম ম্যাকআর্থার। পয়লা অক্টোবর রওনা হয়ে পৃথিবী থেকে ২৫০ মাইল উপরে এই স্পেস স্টেশনে কাটিয়ে, পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরে বেড়িয়ে তাঁর ফিরে আসার কথা অক্টোবরের ১১ তারিখে। ছবিতে (উপরে) দেখা যাচ্ছে মহাকাশ ভ্রমণের জন্য ট্রেনিংয়ের সময় ভরহীন অবস্থায় গ্রেগরি ওলসেনকে।

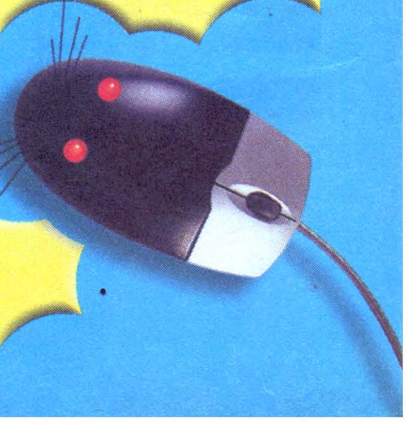


অবাক করা রোবট

১৩০ সেন্টিমিটার অর্থাৎ চার ফুট লম্বা এই রোবটের নাম ইনন। তৈরি করেছে জাপানের ফুজিৎসু কোম্পানি। ইনন-এর গুণ অনেক। চাকা লাগানো এই রোবট (উপরের ছবি) এদিকওদিক ঘুরে বেড়িয়ে অনায়াসে করে ফেলে চোখধাঁধানো সব কাজ। এর দেহে লাগানো আছে ক্যামেরা ও সেন্সর। আর আছে কারও গলা শুনে চিনে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা। এই সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অনেক অসাধ্যসাধন করে ফেলে ও। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ইননের যান্ত্রিক হাত জিনিসভর্তি একটা বাক্স রাখছে টেবিলের উপর।

মস্তিষ্কের বিবর্তন

জীববিজ্ঞানীরা বলছেন, মানব-মস্তিষ্কের বিবর্তন নাকি এখনও ঘটে চলেছে। আর, এই কাজটা হয়ে চলেছে কয়েক হাজার বছর ধরেই। ৩৭,০০০ বছর আগের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আধুনিক মানুষদের মস্তিষ্কের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন দু'টি জিন। মস্তিষ্কের আয়তন থেকে শুরু করে এর জটিল বিন্যাস এবং বুদ্ধিবৃত্তি—সব কিছুর পিছনে এই দু'টি জিনেরই অবদান।



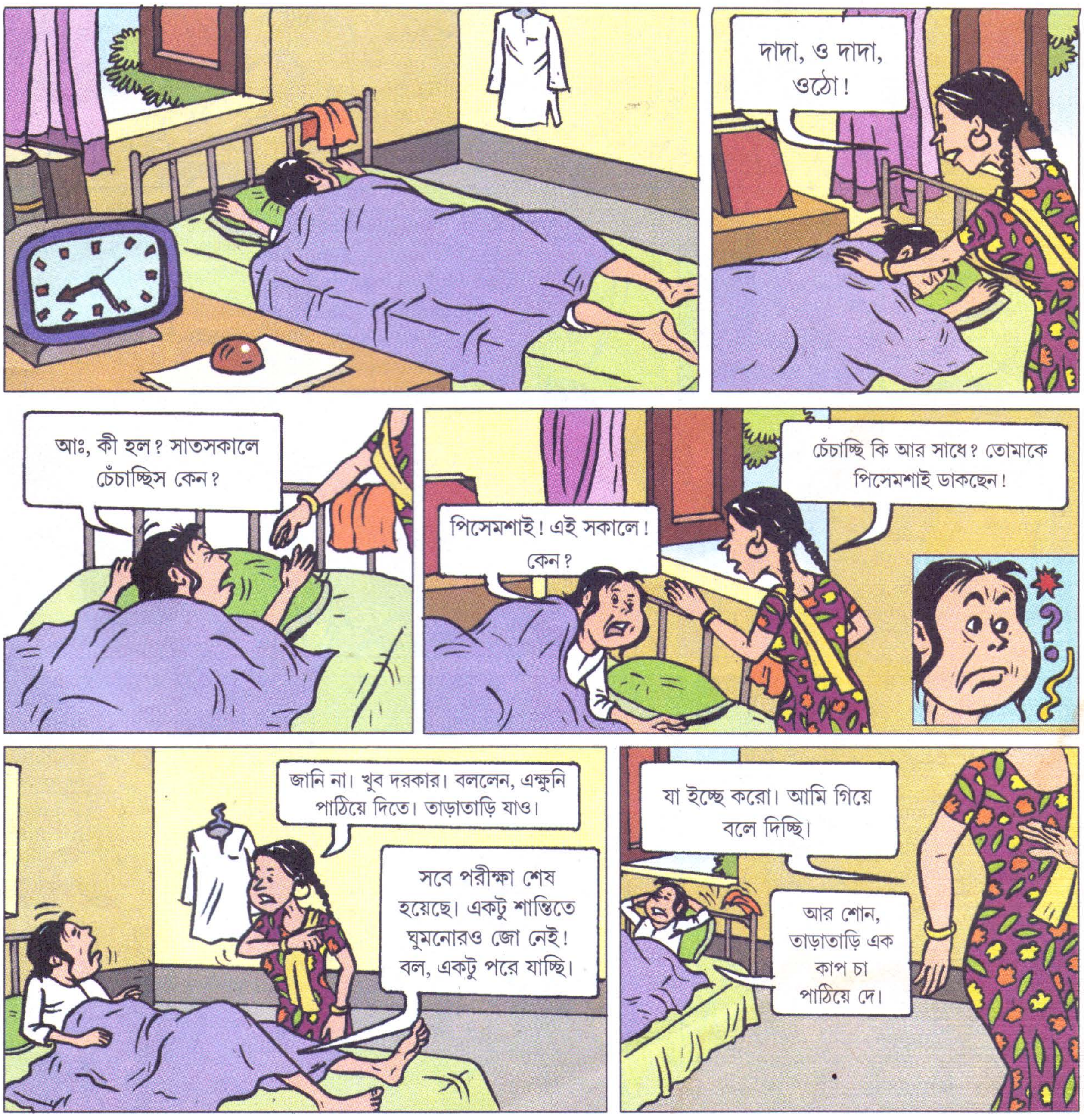
জয় সেনগুপ্ত

মই নিয়ে হইচই



গল্প: শিবরাম চক্রবর্তী

ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

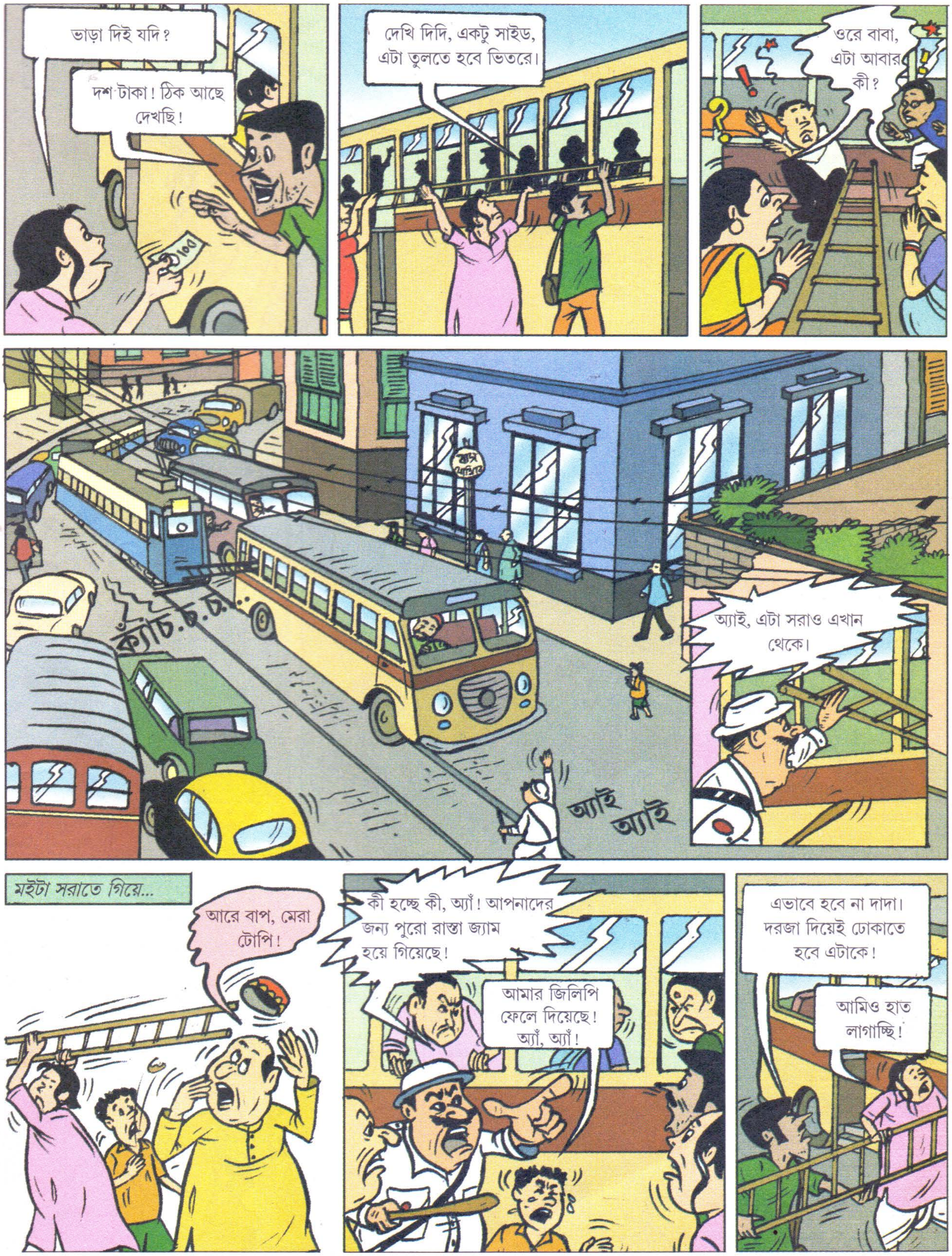



মিনিট কুড়ি পরে...
সাতসকালে কী দরকারে ডেকেছেন কে জানে!
এই যে ভি আই পি, এতক্ষণে সময় হল! সেই কখন ডাকতে পাঠিয়েছি!
না, আসলে, গতকালই কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তাই...তাই আরকী একটু...
তাই একটু ঘুমনো হচ্ছিল। তা, এখন বসে না থেকে আমার একটা কাজ করে দে তো দেখি!
কী কাজ?
কাজ কিছুই না। আমাদের মইটা শান্তালয়ে পৌঁছে দিয়ে আয়। ছবি টাঙাবার, না ঘর সাজাবার—কে জানে কী জন্য দরকার পড়েছে ওদের।
অ্যাঁ শান্তালয়ে! সে কি এখানে! সে তো সেই লেকের কাছে, সাদার্ন অ্যাভিনিউ ছাড়িয়ে, পিসেমশাই!
এখানে নয়? আরে, এই তো এখানেই। এ আর এমন কী দূর হল!
সাদার্ন অ্যাভিনিউ এখানে? বলেন কী?
চা খাওয়া শেষ হলে...
আয়, মইটা সিঁড়িঘরের নীচে আছে। তোকে দেখিয়ে দিই।


এই যে মই। এটা নিয়ে এইটুকু রাস্তা যাওয়া আর এমন কী! এ তো হেঁটেই চলে যাওয়া যাবে!
আপনার কাছে সাদার্ন অ্যাভিনিউ দূর না-ও হতে পারে! কিন্তু যে মই ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে তার কাছে পাক্কা দশ মাইলের রাস্তা। মইয়ের ভারে প্রতি পদক্ষেপেই সেটা দু'শো মাইল বলে মনে হবে তার।
তা, কিসে করে নিয়ে যাব? লরিতে চাপিয়ে নাকি ঠেলাগাড়ি ভাড়া করে? এতটা পথ তো একটা মই বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না!
এইটুকু পথ ঠেলাগাড়ি ভাড়া করে!
না, তা হলে কিসে...!
বাজে বকিস না। যা বললুম কর গে যা!
কী করে যে যাব! বাসে যে নেবে তাও মনে হয় না!
ব্যস, আর একটাও কথা নয়।
ও বাবা, পিসে তো রেগে ফায়ার! আর কিছু জিজ্ঞেস করে কাজ নেই। যেমন করে হোক যেতেই হবে!


মই না নিয়ে গেলে পিসে ফায়ার। আর মই না পেলে শান্তামাসিমা খেপে লাল। তাঁর যা রাগ, এই জাঁদরেল পিসেকেও তিনি পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলবেন।
বাসের কথা ভাবলেও ভয় করে। সেই যে সেবার, বউবাজার থেকে এক বস্তা তুলো বাসে করে আনতে গিয়ে যে কী কাণ্ড হয়েছিল!
নামো এখান থেকে!
হঠাৎ...
আরে ভাই, বাস এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি এগোন।
আরে, আরে, মই নিয়ে উঠছেন কেন? বাসে বসার জায়গা নেই!
মই তো আর বসবে না। দাঁড়িয়ে যাবে!
আরে, না, না! মই নিয়ে বাসে ওঠা যাবে না। একদম জায়গা নেই! উঠুন, দিদি উঠুন।

মই নিয়ে হই চই


ভাড়া দিই যদি?
দশ টাকা! ঠিক আছে দেখছি!
দেখি দিদি, একটু সাইড, এটা তুলতে হবে ভিতরে।
ওরে বাবা, এটা আবার কী?
ক্যাঁচ.চ.চ.
অ্যাই, এটা সরাও এখান থেকে।
অ্যাই অ্যাই
মইটা সরাতে গিয়ে...
আরে বাপ, মেরা টোপি!
কী হচ্ছে কী, অ্যাঁ! আপনাদের জন্য পুরো রাস্তা জ্যাম হয়ে গিয়েছে!
আমার জিলিপি ফেলে দিয়েছে! অ্যাঁ, অ্যাঁ!
এভাবে হবে না দাদা। দরজা দিয়েই ঢোকাতে হবে এটাকে!
আমিও হাত লাগাচ্ছি!


মই নিয়ে হই চই
কোনওরকমে মইটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে...
এটা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে কারও অসুবিধে হবে না!
কিন্তু...
ইয়ে কেয়া হো রহা হ্যায়! মেরে পেট মে ইয়ে কেয়া ঘুস গয়া!
ও মাই গড!
সরি দাদা, আমি সামলে নিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না।
মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের পাশের সিটে বসার পর...
সামহাল্‌কে রাখকো আপনে ইস চিজকো!
বাস চলতে থাকল।
হঠাৎ
ঝনাৎ ঝনাৎ
ঝন
অ্যাই, কী হচ্ছে কী, হিঃ, হিঃ। কী হচ্ছে? হিঃ, হিঃ!
?!
হিঃ, হিঃ। অ্যাই, হিঃ, হিঃ। এ কী রে বাবা! নিজের মই নিজে সামলাতে পারেন না! হিঃ, হিঃ! তখন থেকে খালি...
না, মানে আমি!
মানে, মানে কী করছেন? মইয়ের খোঁচায় আমার...
ইসকো কৌন ঘুসনে দিয়া বাসমে?
হিঃ, হিঃ!
একটাই উপায় আছে এখন!
হরিব্‌ল, হরিব্‌ল!
উপায়টা হল...


কিছুক্ষণ পর
মইটাকে গলায় গেঁথে আর রাখা যাচ্ছে না। এটাকে প্যাসেজের মধ্যে বিছিয়ে রাখলেই তো হয়!
দাদা, দাদা, একটু সরুন। এখানে দাঁড়ানো যাচ্ছে না!
যাক, এবার একটু স্বস্তি!
পরের স্টপে বাস দাঁড়াল।
আরে, রোককে, রোককে ভাইয়া!
ও মাগো
আই বাপ রে!
গেলুম রে!
ইয়ে চিজ় হিঁয়াপর ঘুসায়া কৌন বেতমিজ?
ও বাবা! লোকে বলে, পুলিশে ছুঁলে নাকি আঠারো ঘা, ওদিকে না তাকানোই ভাল!

মই নিয়ে হই চই



(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গল্প



রাজা ফিলিপের ঘোড়া

হেমেন্দুশেখর জানা

"দীর্ঘ বর্শা হাতে নিয়ে প্রথমে ছুটে এগিয়ে যায় পদাতিকবাহিনী, আর শত্রুপক্ষ যখন তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই অতর্কিতে দু'পাশ থেকে ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্ববাহিনী। শত্রু ছারখার হতে বেশি সময় লাগে না। কখনও মাত্র দু'টি প্রহর, কখনও একটি দিন। তুমি কি জানো, সম্মুখযুদ্ধের এ-রীতির কী নাম?"

"কী?"

"ফালাংস। এ-রীতির উদ্ভাবক আমি। বলতে পার, এরই জন্য আজও আমি অপরাজেয়। এ-পথেই ক্ষুদ্র ম্যাসিডনের বিজয়রথ অপ্রতিহত গতিতে ছুটে চলেছে গ্রিসের চতুর্দিকে।"

পাশাপাশি অশ্বারোহণে চলতে-চলতে পিতার মুখের দিকে একবার মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকালেন আলেকজান্ডার। সম্মুখে তেমনই স্থির দৃষ্টি রেখে রাজা ফিলিপ বলে চললেন, "তবে এ-রীতির যুদ্ধে অশ্ব বড় গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শুধু গতি নয়, অশ্বের চাতুর্য, আরোহীর সঙ্গে তার মানসিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতাই প্রধান বিষয়। বিক্রেতারা এলে প্রতিটি অশ্ব তাই আমি নিজে নির্বাচন করি। আর সবচেয়ে খুশি হই।"

নীরব প্রশ্নে আলেকজান্ডার আবার পিতার মুখের দিকে তাকালেন। তেমনই ভঙ্গিতে রাজা ফিলিপ বললেন, "যখন কোনও বিক্রেতা সদ্য ধরা বন্য অশ্ব নিয়ে আসে..."

"বন্য অশ্ব!"

"হ্যাঁ। আস্তাবলে পালিত অশ্ব, যত অল্প বয়স্কই হোক, মানুষের কিছু না-কিছু অভ্যেসে অভ্যস্ত হয়ে যায়ই। কিন্তু বন্য!

তাকে একদম নিজের মতো করে তৈরি করা যায়। আর তৈরি হলে জানবে, সে একটি শাণিত ইস্পাত। দশটি সৈনিকের কাজ সে একাই করবে।"

"এমন অশ্ব কি..."

"খুব বেশি নেই আমার। তবু সংখ্যাও তার বড় অল্প নয়। এই যে তোমার-আমার অশ্ব দু'টি, এরা কিন্তু অরণ্যজাত।"

অশ্ব দু'টিকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন আলেকজান্ডার। অরণ্যের মতোই চিকন ও সুঠাম। অরণ্যের মতোই বড় সহজ ও সাবলীল তাদের দৌড়ের ছন্দ। অরণ্যের মতোই বড় প্রাণবন্ত ও তেজি।

রাজধানী-নগর ছাড়িয়ে অশ্ব দু'টি তখন এগিয়ে চলছিল উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে। সূর্যকরোজ্জ্বল এই প্রভাতে দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন, নীলাভ পর্বতমালাটি। কী উদ্দেশ্যে তাঁরা চলেছেন, আলেকজান্ডার জানেন না। শুধু প্রভাতেই প্রস্তুত হয়ে রওনা হতে হবে পিতার সঙ্গে, এমনই আদেশ গত রাত্রে জানিয়ে এসেছিল দূত। আলেকজান্ডার কোনও প্রশ্ন করেননি। ছুটির আনন্দে অন্তর তাঁর তখন মুক্ত আকাশের মতো উদার হয়েছিল। দীর্ঘ সাতটি বছর জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অ্যারিস্টটলের পাঠশালায় বিদ্যাচর্চা শেষ করে সেই ক'দিন মাত্র প্রাসাদে ফিরে এসেছেন তিনি। এরই মধ্যে পিতা তাঁর নতুন অভিযানে তাঁকে সঙ্গী করবেন, এমনটি কল্পনাও করেননি। নিজেকে বড় গর্বিত মনে হয়েছিল আলেকজান্ডারের। হবে না? পিতার বীরত্ব যে আজ সমস্ত গ্রিসে এক নতুন রূপকথা। অ্যারিস্টটলের পাঠশালায় থাকলেও পিতার প্রতিটি জয়ের সংবাদ তিনি অনুপুঙ্খ পেয়েছেন। পেয়েছেন, আর ততই উদ্‌গ্রীব হয়েছেন পিতার সঙ্গী হতে, যুদ্ধে অংশ নিতে, জয়ের স্বাদ আকণ্ঠ উপভোগ করতে।

চলতে-চলতে মুখ ফিরিয়ে পুত্রের মুখের দিকে একবার তাকালেন রাজা ফিলিপ। প্রভাতের রৌদ্রে বর্ষাশেষের নবীন বৃক্ষের মতো বড় ঝলমল করছেন আলেকজান্ডার। কত বয়স হল পুত্রের? আঠারো নাকি উনিশ? সুউন্নত বলিষ্ঠ শরীর। উজ্জ্বল দু'টি চক্ষু। ভিতরে কী এক শক্তি যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় অক্ষয় পর্বতশৃঙ্গের মতো।

বড় গর্ব অনুভব করলেন রাজা ফিলিপ। সেই সঙ্গে বুঝে নিলেন, উত্তরসূরিকে এবার প্রস্তুত করে নিতে হবে।

তীব্র গতিতে নাতিপ্রস্থ একটি ঝরনাধারা বয়ে যাচ্ছিল সম্মুখে। খুব সাবধানে অশ্ব চালনা করে পিতাপুত্র পেরিয়ে এলেন। একটি-দু'টি মহাবৃক্ষ আকাশ আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে এপারে। আলেকজান্ডার বুঝলেন, দূর থেকে অরণ্যের যে আভাস দেখা যাচ্ছিল, এ-তার প্রান্তসীমা, হয়তো-বা প্রবেশমুখ।

রাজা ফিলিপ এবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি জানো, কোথায় চলেছি আমরা?"

"না।"

"পর্বত সানুদেশের এই অরণ্যে।"

"অরণ্যে! কেন?"

"সম্প্রতি সংবাদ পেলাম, এ-অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিচরণ করে এক বিশেষ প্রজাতির ভীমকায় অশ্ব। আমরা চলেছি সেই অশ্ব আহরণে।"

এতক্ষণে আজকের আয়োজনটি বোধগম্য হল আলেকজান্ডারের। যাত্রার সময় কোনও সৈন্যবাহিনী না দেখে একটু অবাকই হয়েছিলেন তিনি। তবু পিতাকে জিজ্ঞেস করতে পারেননি, যদি কোনও রাজনৈতিক গোপনীয়তা থাকে তাঁর! শুধু দেখেছেন, প্রথামতো দূরত্ব বজায় রেখে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করে চলেছে পঞ্চাশজন দেহরক্ষী। হয়তো আরও পশ্চাতে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নিয়ে অনুগামী হয়েছে অশ্বধরার কর্মীরা। তবু এ-কাজে স্বয়ং পিতাকে অংশগ্রহণ করতে দেখে বড় মুগ্ধ হলেন আলেকজান্ডার। কত সহজে অবকাশ যাপনকেও তিনি কাজের করে তুলতে পারেন!

চলতে-চলতে আলেকজান্ডার জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও যুদ্ধ কি আসন্ন?"

পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন রাজা ফিলিপ, "হ্যাঁ। জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধে এবার অবতীর্ণ হব।"

"বড় যুদ্ধ!"

"চিরশত্রু পারস্যের বিরুদ্ধে। তবে শুধুমাত্র ম্যাসিডনের রাজা হিসেবে নয়, আমি হব গ্রিসের সমস্ত রাষ্ট্রজোটের সর্বাধ্যক্ষ। আর মনে হয়, সেই যুদ্ধই হবে আমার শেষ প্রমাণ।"

"প্রমাণ! কীসের প্রমাণ?"

অশ্বের এবার গতিরোধ করলেন রাজা ফিলিপ। আলেকজান্ডারও সংবরণ করলেন তাঁর অশ্ব। রাজা ফিলিপ স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন পুত্রের চোখে। এ-দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ। যেন দীর্ঘ একটা বর্শা। তবু মনে হয়, বর্শার সূচিমুখে যেন নিগূঢ় একটি যন্ত্রণা।

কয়েকটি পলক অতিবাহিত হয়ে গেল নীরবে। মন্দ্রস্বরে রাজা ফিলিপ বললেন, "আমি গ্রিক, তারই প্রমাণ। এ-দেহ আমার গ্রিসেরই পঞ্চরত্নে গঠিত, এ-দেহের রক্তে ছুটে যায় গ্রিসের ঐতিহ্য, এ-মন আমার আজন্ম বহন করে চলেছে গ্রিসেরই সভ্যতা ও কৃষ্টি, তারই প্রমাণ। রাজা ফিলিপ অবিসংবাদিত এক গ্রিক, মাতৃভূমি তাঁর দেবধন্য এই গ্রিস তারই প্রমাণ।"

পিতার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন আলেকজান্ডার। অটল পর্বতের মতো মহাবীর, কঠিন পিতার বুকে তবে গভীর গোপনে এত অশ্রু ঝড়ে পড়ে!

অনেকক্ষণ দু'জনের কেউই কোনও কথা বলতে পারলেন না। একসময় আলেকজান্ডার ডাকলেন, "পিতা!"

নিজেকে সংযত করলেন রাজা ফিলিপ। তারপর মুখ তুললেন। কোন সুদূরের এক তন্ময়তা ধীরে-ধীরে নেমে এল তাঁর দৃষ্টিপথে, "আমি যখন জন্মাই, তখন ম্যাসিডন ছিল হতদরিদ্র, গ্রাম্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি রাষ্ট্র। মানুষের জীবিকা ছিল শিকার আর চাষবাস। নগর জীবনের কোনও আলো তাদের ছিল না। ওরা তাই ম্যাসিডনের অধিবাসীদের বলত বর্বর।"

"ওরা বলতে?"

একাগ্র দৃষ্টিতে পিতার জীবনের গল্প শুনছেন আলেকজান্ডার। তেমনই ধীর, শীতল কণ্ঠে রাজা ফিলিপ বলে চললেন, "ওরা বলতে উন্নত নগররাষ্ট্রগুলো। আথেন্স, থিবস, অলিম্পিস, স্পার্টা, থেসালি, করিন্থ। এমনকী ওরা আমাদের গ্রিক বলে স্বীকারও করত না।"

"কেন?"

"ভৌগোলিক কারণেই ম্যাসিডন, পাহাড়-পর্বতে ঘেরা, গ্রিসের একদম প্রান্তসীমায়। সুদৃঢ় কোনও রাষ্ট্রের ভিত্তি তার উপর ছিল না, ছিল না কোনও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাও। কয়েকটি গোষ্ঠীতে তখন বিভক্ত ছিল ম্যাসিডন। এ-গোষ্ঠী ও-গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই চলত



অহরহ। বিজয়ী গোষ্ঠী-প্রধান হত রাজা। তবু অধিকাংশ সময় তারও আয়ুষ্কাল হত অল্প। তাকে হত্যা করে রাজা হত আর-এক গোষ্ঠী প্রধান। ম্যাসিডন তখন ছিল রক্তাক্ত, উপদ্রুত। সে কারণেই গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটেছিল ওই রাষ্ট্রগুলোতে, তার একটি কণাও তখন এসে পৌঁছয়নি ম্যাসিডনে। অথচ আজকের মতো সেদিনও আমরা গ্রিক ভাষাতেই কথা বলতাম। অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে অংশ নিত ম্যাসিডনের অধিবাসীরা। তারা বিজয়ীও হত। তবু, তবু ওরা আমাদের।"

বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে পারলেন না রাজা ফিলিপ। কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর যন্ত্রণাটি। এক মুহূর্ত থেমে নিজেকে সংবরণ করলেন তিনি। তারপর বললেন, "তুমি কি জানো, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে হতভাগ্য কে?"

আলেকজান্ডার কোনও কথা বললেন না। নীরবে তাকিয়ে রইলেন পিতার মুখের দিকে। রাজা ফিলিপ বললেন, "দেশে জন্মেও যার কোনও দেশ নেই। অখণ্ড এক জাতিসত্তার উত্তরসূরি হয়েও জাতি হিসেবে যার কোনও পরিচয় নেই।"

নিঃশব্দে আবার অতিবাহিত হয়ে গেল কয়েকটি মুহূর্ত। রাজা ফিলিপ বললেন, "তখন কৈশোরে পদার্পণ করেছি। থিবসের কাছে পরাজিত হল ম্যাসিডন। থিবস কিন্তু ম্যাসিডনের দায়িত্ব নিল না। হয়তো ঘৃণায়। সন্ধির শর্ত অনুসারে গোষ্ঠীপ্রধানের পুত্র হিসেবে আমার মতো আরও কয়েকজনকে জামিন হিসেবে থিবসে বাস করতে বাধ্য করা হল। যাকে বলে নজরবন্দি। তীব্র সেই অসম্মানে সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম, আমার কোনও দেশ নেই, জাতি হিসেবে আমার কোনও পরিচয় নেই। সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলাম, আমাকে প্রমাণ করতে হবে। "

"তারপর?"

"আলস্যে কালাতিপাত না করে থিবসে বসেই গ্রিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে লাগলাম। গুরু পেলোপিডসের কাছে শিক্ষা করলাম রাষ্ট্রনীতি। আর গুরু ইপামিনন্ডস আমাকে উজাড় করে দিলেন তাঁর যুদ্ধবিদ্যা। তারপর একদিন ম্যাসিডনে ফিরে আসার অনুমতি পেলাম। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে চেষ্টা করলাম সমগ্র ম্যাসিডনকে ঐক্যবদ্ধ করার। কিন্তু কেউই কর্ণপাত করল না। গোপনে তখন গড়ে ফেললাম এক সৈন্যবাহিনী ম্যাসিডনের পার্বত্য অঞ্চলের অবাধ্য, অশান্ত কিছু মানুষ নিয়ে। তারপর দখল করলাম ম্যাসিডনের সিংহাসন। আর তারপর..."

তারপরের ইতিহাস আলেকজান্ডারের জানা। যে সৈন্যবাহিনী পিতা গড়ে তুলেছিলেন, তারা আপাদমস্তক পূর্ণ ছিল জাতিগর্বে। সেই শক্তিতে আবার কখনও পিতার কূটকৌশলে একটু-একটু করে চতুর্দিকে বিস্তৃত হতে লাগল ম্যাসিডনের শাসনক্ষেত্র। আথেন্স ও অলিম্থিসকে পরাজিত করে পিতা একের পর-এক দখল করলেন অ্যামফিপলিস, পিডনা, পটিডিয়া। তারপর থার্মপলির গিরিবর্ত্ম পার হয়ে আথেন্স ও থিবসের সম্মিলিত জোটশক্তিকে তিনি পরাজিত করলেন চেরোনিয়ার যুদ্ধে। সমস্ত গ্রিসে রাজা ফিলিপ তাই এক অপ্রতিহত শক্তি, একমাত্র শক্তি।

॥ ২ ॥

ক্ষীণ অথচ তীব্র গতিশীল একটি নদী সমগ্র অরণ্যভূমিকে দু'ভাগ করে প্রবাহিত হয়েছে পূর্ব দিকে। ওপারে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসেছিলেন রাজা ফিলিপ ও আলেকজান্ডার।

এখন মধ্যাহ্ন। অশ্ব ধরার কাজে সাময়িক বিরতি চলছে। সেই অবকাশে দ্বিপ্রাহরিক আহারটি সম্পূর্ণ করে নিয়েছেন পিতাপুত্র।

এখান থেকে আরও অর্ধ যোজন উত্তরে গভীর অরণ্যে পাতা হয়েছে ফাঁদ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাফল্য শূন্য। মনে হয়, এই প্রজাতির অশ্বগুলো বড় বুদ্ধিমান। বিপদ আন্দাজ করে নিজেদের গোপন করেছে আরও দূর অন্তরালে।

মনে-মনে এই ব্যর্থতারই পর্যালোচনা করছিলেন রাজা ফিলিপ। হঠাৎ চমকে উঠলেন। অনতিদূরে ঘনসন্নিবদ্ধ বৃক্ষসারির ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ ছুটে গেল। ও কি বিদ্যুৎ নাকি দ্রুতগামী কোনও অশ্ব! অশ্বের এমন গতি, পদে-পদে বৃক্ষের প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে এমন গতিময় কোনও অশ্ব কোনওদিন কি দেখেছেন তিনি!

ভোজন অসমাপ্ত রেখে উঠে দাঁড়ালেন রাজা ফিলিপ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্বেষণ করতে লাগলেন অশ্বটিকে। আর তৎক্ষণাৎ পলকমাত্র উদ্ভাসিত হয়ে শুভ্র বিদ্যুৎ আবার অন্তর্হিত হয়ে গেল সবুজ মেঘের ভিতর।

দীর্ঘ রজ্জুবিশিষ্ট দু'টি লাগাম হাতে অদূরে দাঁড়িয়েছিল এক কর্মী। এরকমই নির্দেশ ছিল তার উপর। হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে তারই একটি রজ্জু হাতে নিলেন রাজা ফিলিপ। কোনও কিছুই দৃষ্টি এড়ায়নি আলেকজান্ডারের। মৃদু স্বরে বললেন, "আপনি নিজে ধরবেন?"

তেমনই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ফিলিপ বললেন, "হ্যাঁ। এক পলকের দর্শন, তবু প্রত্যয় হয়, ওই অশ্ব রাজঅশ্ব। ওই অশ্ব তাই ধরতে হয় রাজাকেই। রাজাকে পৃষ্ঠে নিয়ে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সে ছুটে যাবে দেশের পর-দেশ। সেই হবে তাঁর গৌরব।"

"আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি?"

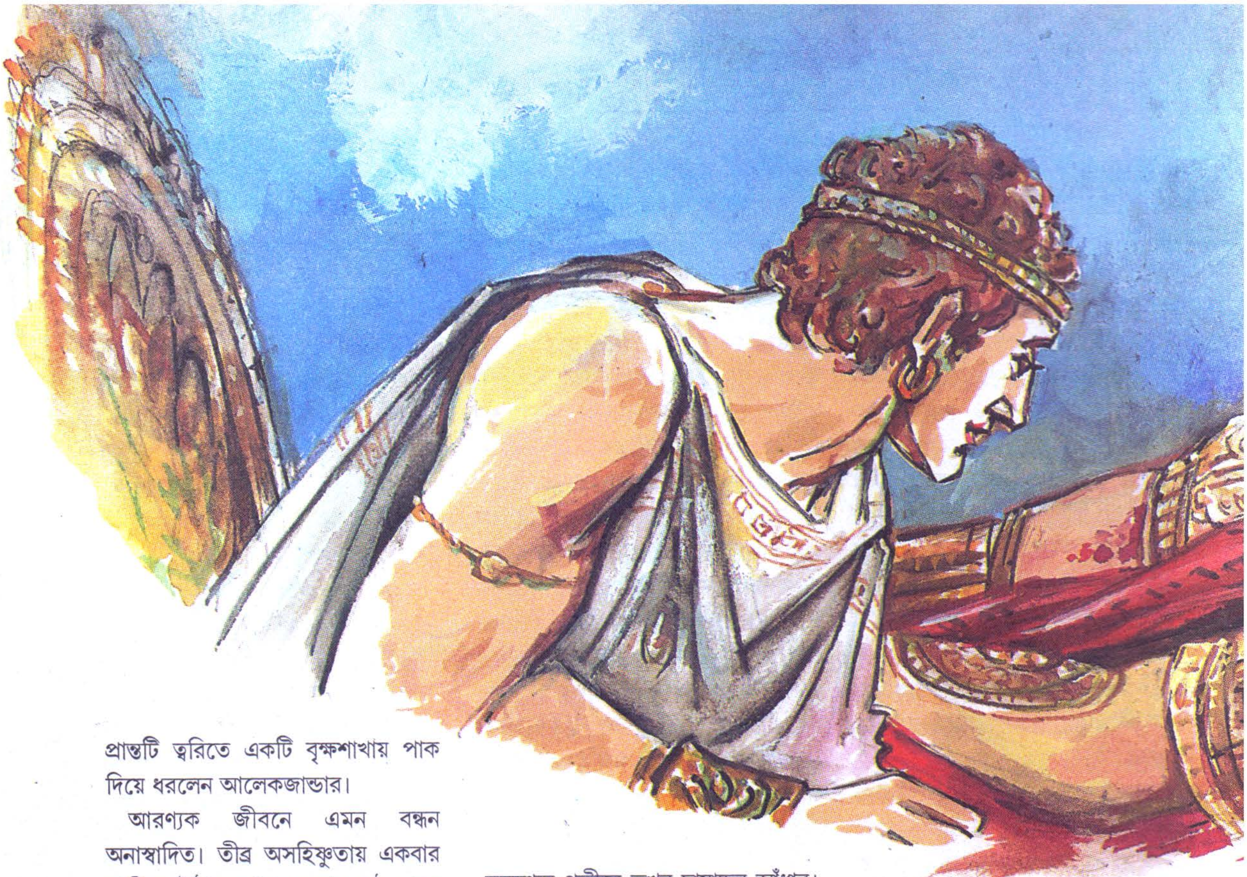
"পার। একমাত্র তুমিই পার।"

পাথরের উপর থেকে নেমে এলেন পিতাপুত্র। অশ্বরাজের গতিমুখ অনুসরণ করে পশ্চিমে খানিক অগ্রসর হয়ে বড় একটা গাছের আড়ালে নিজেদের গোপন করলেন। কে জানে, এদিকেই অশ্বরাজ উদয় হবেন কি না?

সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। অরণ্যের ভিতরে ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছিল ছায়া। রাজা ফিলিপ এবার বিচলিত হলেন। আর বেশিক্ষণ এই অরণ্যে থাকা সমীচীন হবে না। দিনান্তের সময় থেকে হিংস্র শ্বাপদে এ-অরণ্য বড় ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

আরও কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। সাদা বিদ্যুৎ আবার ঝলসে উঠল সবুজ মেঘমণ্ডলে। রাজা ফিলিপের অনুমান নির্ভুল। দৌড়ে এসে অশ্বরাজ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে মাত্র একরশি পথ দূরেই। সঙ্গিনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। নাকি খোঁজ নিচ্ছে, ফাঁদ পেতে রাখা শত্রুরা তার রাজ্য ত্যাগ করে গেল কিনা! মাত্র একটি মুহূর্ত। আর সেই অবসরেই রাজা ফিলিপ ক্ষিপ্র গতিতে নিক্ষেপ করলেন হাতের দীর্ঘরজ্জু লাগামটি। অশ্বরাজের সম্মুখে বড় বৃক্ষের কোনও অন্তরাল ছিল না। চক্ষের পলকে লাগামের ফাঁসটি নিখুঁত লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল অশ্বরাজের গলায়।

দৌড় দেওয়ার তখন উপক্রম করেছিল অশ্বরাজ। শরীরে গতি সঞ্চার হওয়ামাত্রই সুদৃঢ় ফাঁসটি আরও কঠিন হয়ে বসল তার গলায়। আর তৎক্ষণাৎ রজ্জুর অপর



প্রান্তটি ত্বরিতে একটি বৃক্ষশাখায় পাক দিয়ে ধরলেন আলেকজান্ডার।

আরণ্যক জীবনে এমন বন্ধন অনাস্বাদিত। তীব্র অসহিষ্ণুতায় একবার লাফিয়ে উঠল অশ্বরাজ। তার কণ্ঠ থেকে বারংবার নির্গত হতে লাগল ক্রুদ্ধ হ্রেস্বাধ্বনি।

অপলক দৃষ্টিতে অশ্বরাজকে দেখছিলেন আলেকজান্ডার। অশ্ববিদ্যা তাঁর অধিগত। তিনি জানেন, পৃষ্ঠে আরোহণ করে স্বাধীনতা হরণ না করা পর্যন্ত ক্রোধ প্রশমিত হয় না কোনও অশ্বের। অনুচ্চ কণ্ঠে সে-কথাই পিতাকে জানালেন তিনি। রাজা ফিলিপ পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন, "তুমি পারবে?"

"পারব, পিতা।"

"মনে রেখো, বন্য শক্তি বড় ভয়ংকর।"

সতর্ক পদে আলেকজান্ডার এগিয়ে গেলেন। অশ্বরাজের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে খানিক দূরত্বে দাঁড়ালেন তিনি। মনুষ্যের উপস্থিতি টের পেয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল অশ্বরাজ। তারপরই ক্রোধে দৌড়ে গেল আলেকজান্ডারের দিকে। প্রস্তুত ছিলেন তিনি। ক্ষিপ্র পদে লাফিয়ে উঠে ধরে ফেললেন একটি বৃক্ষশাখা। অশ্বরাজ গতি সংবরণ করে ঘুরে দাঁড়াতেই আলেকজান্ডার ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার পিঠে।

মৎসশিকারি যেমন নানা কৌশলে ধীরে-ধীরে বশীভূত করেন মৎস্যরাজকে, অশ্বরাজও তেমনই এক সময় স্থির হল।

অরণ্যের গভীরে তখন ছায়াচ্ছন্ন আঁধার। রাজা ফিলিপ এগিয়ে এলেন আলেকজান্ডারের সামনে। মুখমণ্ডলে তাঁর গর্বের তৃপ্তি। বললেন, "এই অশ্বের পৃষ্ঠে তোমাকেই মানায়। তুমিই যোগ্যতম তুমি এ-অশ্বের পৃষ্ঠে। এই অশ্ব তাই আমি তোমাকেই দিলাম। এই অশ্বের নাম হোক 'বুকিফেলাস'।"

॥ ৩ ॥

ম্যাসিডনে তখন বসন্ত এসেছে। বাতাসে-বাতাসে তারই ঈষদুষ্ণ পরশ। পরশের গভীরে এক অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য। গ্রামের সহজ মানুষগুলো বড় অবাক হয়। নবীন পাতায়-পাতায়, কুসুমে-কুসুমে তেমনই উচ্ছ্বসিত বৃক্ষগুলো, তেমনই স্বচ্ছ সুনীল আকাশ, রৌদ্রের ভিতর তেমনই মাখামাখি স্বর্ণকণিকা। তবু এ বসন্ত যেন নতুনতর! শতবর্ষের প্রবীণ বলেন, "এমন বসন্ত পূর্বে কখনও আসেনি ম্যাসিডনে।"

বসন্তের আনন্দে ম্যাসিডনবাসী আজ মগ্ন। মগ্ন তাদের রাজার আলোচনায়। রাজা ফিলিপ আজ সমগ্র গ্রিসের রাজা।

পক্ষকাল আগে করিন্থ শহরে গ্রিসের সমস্ত রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন রাজা ফিলিপ। উদ্দেশ্য, সকল গ্রিক রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করে চিরশত্রু পারস্যের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এখনও গ্রিসের কয়েকটি রাষ্ট্র পারস্যের অধীন। তা ছাড়া বহুদিন পূর্বে আথেন্স দগ্ধ করে পারস্য যে পাপ করেছিল, তার প্রতিশোধও এবার নেওয়া দরকার। সেই সম্মেলনেই রাজা ফিলিপকে গ্রিসের সর্বাধিনায়ক হিসেবে মেনে নিয়েছে সমস্ত রাষ্ট্র। স্থির হয়েছে, বসন্তের অন্তিম লগ্নে আর একটি মাস পরেই সম্মিলিত গ্রিক বাহিনী নিয়ে রাজা ফিলিপ এশিয়া মাইনরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন।

সেই যুদ্ধেরই এখন প্রস্তুতি চলছে ম্যাসিডনে। সংগৃহীত হচ্ছে সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, উপযুক্ত পরিমাণে রসদ। চলছে সৈন্যদের নিয়মমতো মহড়া। প্রবল এক উদ্দীপনায় ম্যাসিডন আজ যেন জেগে উঠেছে।

এই ব্যস্ততার মধ্যেই একদিন সংবাদ এল, রাজা ফিলিপ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চলেছেন। কন্যা আথেন্সের এক গ্রিককুমারী, ক্লিওপেট্রা। রাজধানীর সংবাদ, সেই বিবাহের আয়োজনও সম্পূর্ণ। শতবর্ষের প্রবীণ মানুষটি একবার



আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "বসন্তের আকাশে আজ একখণ্ড কালো মেঘ দেখছি। স্বাভাবিক নিয়ম এটি নয়। দুর্যোগও ঘনাবেই। তোমরা প্রস্তুত হও।"

রাত্রি তৃতীয় প্রহর তখন। সমস্ত প্রাসাদ নিদ্রায় মগ্ন। শুধু আপন শয়নকক্ষে রাজা ফিলিপ একাকী নিদ্রাহীন। আজ তাঁর অন্তর বড় অস্থির। সমস্ত কক্ষে শ্লথ ভঙ্গিতে পাদচারণা করছেন তিনি। আর মাঝে-মাঝেই তাঁর মানসপটে ভেসে উঠছে মহিষী অলিম্পিয়াসের মুখ। সে মুখ বড় রুষ্ট। দু' চোখের গভীরে আগুন।

মহিষীর রুষ্ট মুখখানিই বিগত দু'দিন বড় বিচলিত করে তুলেছে তাঁকে। তাঁর দ্বিতীয় বিবাহে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গিয়েছেন তিনি। প্রতিজ্ঞা করেছেন, যেমন করেই হোক, এ বিবাহ তিনি রোধ করবেন।

একবার ভেবেছিলেন, এ বাসনা পরিত্যাগ করবেন তিনি। সম্মুখেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্মযজ্ঞ। আজন্মের অসম্মানকে মুছে ফেলার, সমস্ত গ্রিসের কাছে নিজেকে প্রমাণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত। এ সময় বিচলিত হওয়া উচিত নয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায় পদে-পদে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর পৌরুষ বড় অভিমানী করে তুলেছিল তাঁকে। শত-শত উত্তুঙ্গ বাধা অনায়াসে অতিক্রম করে এসে শেষে কিনা পরাজিত হবেন এক রমণীর প্রতিবাদের কাছে! তা ছাড়া সমস্ত গ্রিসে তাঁর বিবাহ এখন সংবাদ। আয়োজনও সম্পূর্ণ। এই অবস্থায় তাঁর পশ্চাদপসরণ...

ক্লান্তিতে দু' চোখ বুজে এল রাজা ফিলিপের। গভীর একটি শ্বাস উদ্গত হল তাঁর বুক থেকে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত। আগামীকাল প্রত্যূষেই অনুষ্ঠিত হবে তাঁর বিবাহবাসর।

অগণিত দর্শনার্থীতে বিবাহসভা পূর্ণ। নাতিউচ্চগ্রামে বাদকরা বাজাচ্ছেন মঙ্গলবাদ্য। দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে ধীরে-ধীরে বিবাহমঞ্চে উপস্থিত হলেন রাজা ফিলিপ। কিন্তু বরাসনে উপবেশন করার আর সুযোগ পেলেন না তিনি। অকস্মাৎ তির গতিতে একটি ছুরি উড়ে এসে আমূল বিদ্ধ হল তাঁর বুকে। একটি আর্তনাদ শুধু নির্গত হল তাঁর মুখ থেকে। তারপর দু' হাতে বুক চেপে তিনি লুটিয়ে পড়লেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাজন্যবর্গ। তারপর দৌড়ে এলেন মঞ্চে। অস্ফুট স্বরে রাজা ফিলিপ বললেন, "পুত্র আলেকজান্ডারকে খবর দাও।"

প্রাসাদ থেকে বিবাহমঞ্চটি বেশি দূর নয়। ত্বরিত সেখানে উপস্থিত হলেন আলেকজান্ডার। মুমূর্ষু পিতার মাথা তুলে ধরলেন তাঁর দুই করতলে। মৃদু স্বরে ডাকলেন, "পিতা!"

ধীরে-ধীরে অবসন্ন দু' চোখ মেলে তাকালেন রাজা ফিলিপ। বললেন, "আমি পারলাম না, পুত্র। সব দায়িত্ব আমি তোমাকেই দিলাম। বিশ্ববাসীকে তুমিই জানিয়ে দিও, রাজা ফিলিপ গ্রিক, আলেকজান্ডার গ্রিক, সকল ম্যাসিডনবাসী..."

স্বর রুদ্ধ হল রাজা ফিলিপের। মুদ্রিত হয়ে এল তাঁর চোখ। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে এল এক বিন্দু অশ্রু।

বুকিফেলাস তখন দাঁড়িয়েছিল মঞ্চের বাইরে। আলেকজান্ডার উঠে বসলেন তার পিঠে। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল বুকিফেলাস। সমগ্র গ্রিস পরিক্রমা করে সে পৌঁছে গেল এশিয়া মাইনর। তারপর সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, মিশর ভূমধ্যসাগরের উপকূল ছুঁয়ে পারস্য। তা পেরিয়ে... ওই, ওই দেখা যায় সুদূর প্রাচ্য।

রাজা ফিলেপের ঘোড়া ছুটে যায়। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ছুটে যায় রাজা ফিলিপের ঘোড়া।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল



টুটুল ও জাদুকর

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

"লাগ লাগ চৌয়া লাগ।" হাত-পা নেড়ে চোখ বড়-বড় করে মোহনলাল ডাইস ছুড়ে দেন। আর অনেক ছাত্রের মতো ক্লাস সেভেনের টুটুলও অবাক হয়ে দ্যাখে, ঠিক চার পড়েছে।

মোহনলাল এবার ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় বললেন, "ভাইসব, তোমরা ভাবছ এ কী করে সম্ভব। ডাইসটা কী আমার কথা শোনে? আমি জানাই, হ্যাঁ ভাই কথা শোনে। এটা যে-সে ডাইস নয়, স্বয়ং গুরুদেব কান্তিভাই আমায় দিয়েছিলেন।"

টুটুল এবার সাহসে ভর করে জাদুকরকে প্রশ্ন করে, "আমরা যদি কোনও নম্বর বলি তাও উঠবে?"

"নিশ্চয়ই, বলো কী চাও?" মোহনলাল আত্মবিশ্বাসী।

"ছক্কা চাই ছক্কা।" টুটুল জোর গলায় বলে ওঠে।

জাদুকর ছক্কা ফেলে দেখিয়ে দেন।

"বাঃ, ভারী মজার খেলা তো। দেখি একবার।" হাতে নিয়ে ডাইসটা নেড়েচেড়ে দ্যাখে টুটুল। কোনও বিশেষত্ব নজরে পড়ে না। তারপর হঠাৎ করে বলে ওঠে, "লাগ লাগ লাগ, পাঞ্জা লাগ।" সঙ্গে-সঙ্গে ডাইসটা গড়িয়ে দেয়।



কিন্তু ওর চেষ্টা বিফল করে ডাইসে ওঠে তিন। মোহনলাল ওর দিকে তাকিয়ে করুণার হাসি হাসেন, "দ্যাখো, তোমার হাতে দিয়েছি বলেই তুমি চেলে দেবে আর সঙ্গে-সঙ্গে নম্বর উঠে যাবে? ব্যাপারটা এত সস্তা! এরকম কখনও কোরো না খোকা। এই জন্য ম্যাজিশিয়ানরা কিছু দিতে চান না কারও হাতে। ম্যাজিক যে-সে জিনিস নয় হে। সাধনা লাগে বহুদিনের। গুরুদেবের কাছে কত দিন শিখেছি জানো?"

"সরি স্যার।" মোহনলালের হম্বিতম্বিতে টুটুল ম্রিয়মাণ।

"ঠিক আছে, বাচ্চা ছেলে, না জেনে ভুল করে ফেলেছ। আর কখনও কোরো না।"

এর পর ম্যাজিশিয়ান অন্য খেলা দেখাতে থাকেন। সরস্বতী ইনস্টিটিউশনে আজ বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব। এই উপলক্ষে জাদু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একতলার হলঘরের একপাশে ছোট এক মঞ্চ তৈরি হয়েছে। টুটুল ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয় না, আবার শেষের দিকেও থাকে না। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ আছে ওর। যেমন আজকের এই ম্যাজিক শো দারুণ আকর্ষক লাগছে ওর।

"বাঃ, অপূর্ব!" আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে টুটুল।

ম্যাজিশিয়ান টেবিলের উপর নিজের টুপি রেখেছিলেন। সেই টুপি তুলতেই ফটফট করে পায়রা বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। টুটুল একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ। এই সুযোগ ছাড়া চলবে না। মোহনলালকে যখন কাছে পাওয়া গিয়েছে তখন দু'-একটা খেলা শিখে নিতে হবে।

"না ভাই, এখানে কোনও খেলা শেখাতে পারব না।" মোহনলাল যেন ওর টগবগ করে ফুটতে থাকা উৎসাহে ঠান্ডা জল ঢেলে দেন। তবু টুটুল জেদ করতে থাকে। ওর আগ্রহ দেখে জাদুকর এক সময় নরম হন। এক টুকরো কাগজে খসখস করে লিখে বললেন, "এই নাও আমার ঠিকানা। রবিবার সকাল ন'টার মধ্যে বাড়িতে পাবে।"

পরের রবিবার বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর ম্যাজিশিয়ানের বাড়ি পৌঁছে টুটুল একেবারে দমে যায়। শ্যামপুকুর স্ট্রিট থেকে ডাইনে বাঁক নিয়ে এক এঁদো গলিতে পুরনো এক বাড়ির একতলায় দু'টো ছোট ঘর নিয়ে থাকেন মোহনলাল। টুটুল সেখানে যেতে তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, "বাঃ, তোমার তো জেদ আছে ছোকরা। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম নেহাতই কথার কথা। তুমি কষ্ট করে বাড়ি আসবে না।"

টুটুলের মুখে কথা সরে না। মোহনলালের বাড়ি দেখে সে বড় নিরাশ। যে ঘরে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে বসার একটা চেয়ার আছে বটে কিন্তু সারা ঘরে আজস্র মালপত্র এলোমেলো। তার চোখমুখের ভাব দেখে মোহনলাল বললেন, "কী দেখছ ভাই, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তো? আরে ভাই, আমি বলি, জীবনটাই হল গিয়ে ম্যাজিক। যাঁরা পারেন তাঁরা তরতরিয়ে উপরে উঠে যান, আর যাঁরা পারেন না তাঁরা পিছনে পড়ে থাকেন। জীবনের ম্যাজিক আমার শেখা হয়নি ঠিকমতো।"

টুটুল লজ্জা পায়, "কী যে বলেন।"

"না-না, ঠিকই বলছি। তবে, ব্যাড ফেজ ইজ ওভার। অবধূত মহারাজ বলেছেন, সামনের পাঁচ বছরে আমার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। ভীষণ ভাল সময় আসছে আর তাকে সাহায্য করবে মহারাজের দেওয়া এই ইন্দ্রনীল।"

এরপর মোহনলাল তাকে দেখতে-দেখতে বললেন, "কী যেন জানতে চাইছিলে সেদিন?"

"বেশি কিছু নয়।" টুটুল সলজ্জভাবে বলে, "আপনি কার কাছে ম্যাজিক শিখেছিলেন। আর যদি দু'-একটা খেলা শিখিয়ে দেন প্লিজ।"

মোহনলাল টুটুলের পাশে ছোট এক টুলে বসে বললেন, "এই লাইনে ঢুকে পড়ি বড় অদ্ভুতভাবে। তখন বোধ হয় ক্লাস নাইন চলছে। শীতকালে সিঁথির কাছে এল 'বোস সার্কাস'। তা আমরা দু'-বন্ধু যোগেন ও আমি এক বিকেলে সার্কাস দেখতে যাই। আমাদের ছেলেবেলায়, মানে ধরো পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ সালে। তখন সার্কাসের পরিচালনা ও মালিকানা ছিল বাঙালির হাতে। বোস সার্কাসের প্রতিষ্ঠা করেন মন্মথনাথের ছেলে মতিলাল বসু। ওখানে ম্যাজিক দেখাতেন গণপতি চক্রবর্তী। এই গণপতিকে ভারতীয় জাদুবিদ্যার আদি পুরুষ বলা যেতে পারে। ওঁর খেলা দেখে আমি তো পুরোপুরি দিশেহারা। যে করেই হোক এই খেলা আমায় শিখতে হবে। সার্কাসের পর পাশের ঘরে গিয়ে ধরি ওঁকে। যোগেনের অত বেশি উৎসাহ নেই, তাই একাই গিয়েছিলাম। সেদিন তো উনি আমায় বাচ্চা ছেলে বলে আমলই দিলেন না। পরে ফের যেতে, আমার দারুণ আগ্রহ দেখে দিলেন ওঁর লেখা এক বই, 'সচিত্র অদ্ভুত জাদুবিদ্যা'। বইটা পড়ে আবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।"

"আপনি দেখা করেছিলেন?" টুটুল প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

"নিশ্চয়ই, আর এইভাবেই ক্রমশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাই এই ম্যাজিকে। আমার সমস্ত সময় নিয়ে নেয়, অহোরাত্রি ডুবে থাকি এর মধ্যে। এমনকী, এই ম্যাজিকের জন্য ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তেমন ভাল ফল করতে পারিনি। অথচ খারাপ ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু তুমি এত কিছু জানতে চাইছ কেন?"

মোহনলালের প্রশ্নে উদ্দীপ্ত টুটুল গড়গড় করে বলে যায়, "আমি যে ম্যাজিক শিখতে চাই। স্কুলে সেদিন আপনার খেলা দেখে অবাক হয়ে গেছি। আমার মনপ্রাণ জুড়ে আছে কেবল ম্যাজিক।"

জাদুকর একমত হন, "ম্যাজিক এমন করেই কাছে টেনে নেয়। এর মোহিনী শক্তি আছে। তবে আমি বলি কী, তুমি এখন মন দিয়ে লেখাপড়া করো, অন্তত আই এ পর্যন্ত। তারপরও যদি টান থাকে তখন না হয়..."

"না, না, ওসব বলে আপনি আমায় দমিয়ে দিতে পারবেন না। আমি ম্যাজিক শিখবই। হাতেখড়ি হিসেবে যদি দু'-একটা খেলা শিখিয়ে দেন, বড় ভাল হয়।"

অনেকক্ষণ ঝুলোঝুলির পর মোহনলাল টুটুলকে দু'টো তাসের খেলা শিখিয়ে দেন। টুটুল তো দারুণ খুশি। সে ভাবেইনি প্রথমদিনই খেলা শিখতে পারবে। মোহনলালের কাছে অনুরোধ করে বারচারেক দেখার পর দু'টো খেলা মোটামুটি রপ্ত করতে পেরেছে। এখন বাড়ি গিয়ে দু'টো কাজ। প্রথমেই এক প্যাকেট তাস কিনতে হবে, আর গণপতি চক্রবর্তীর সচিত্র অদ্ভুত জাদুবিদ্যা সংগ্রহ করতে হবে। পুরনো বই পাওয়া ভীষণ শক্ত, কলেজ স্ট্রিটে খোঁজ করতে হবে।

"দ্যাখো, টুটুল দিন-দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। পড়াশোনায় মন নেই একদম, পাশ করবে কী করে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি। এখন ক্লাস টেন চলছে, মাঝে মোটে কয়েকটা মাস। তারপর ম্যাট্রিক ফাইনাল। ও কী যে করবে।" টুটুলের মা মানসী স্বামীকে অভিযোগ জানান।

"তা ও কী করে সারাদিন? টোটো করে ঘোরে দুপুর রোদে?"

"না, তা করে না। তবে ঘরে থাকলেও পড়ার বই খুলেও দ্যাখে না। কোথায় গরমের ছুটিতে ভাল করে তৈরি হবি, তা নয়, ম্যাজিক নিয়ে মেতেছে।"

"ম্যাজিক তো ভাল নেশা। স্কুলের সেই শো দেখার পর থেকেই তো দেখছি ওই নিয়ে মেতে আছে দিনরাত। তবে ঠিকমতো শিখতে পারলে খারাপ হবে না। সরকারসাহেবের তো নাম বেড়েই চলেছে দিনদিন।"

"তুমি আর বোলো না! কোথায় পি সি সরকার আর কোথায় আমাদের পড়া ফাঁকি দেওয়া ছেলেটা।"

"না, শুরুতেই তো কেউ বড় হয় না। শিখে অনুশীলন করে দিনেদিনে বেড়ে ওঠে, তাই না?"

"এই দ্যাখো তুমিও কী ভুলে গেলে নাকি টুটুলের ওই দু'-একটা তাসের খেলা দেখে!"

"ভুলে যাব কেন? তবে ম্যাজিক খারাপ জিনিস নয় মোটেও। এর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। যদি নিষ্ঠা নিয়ে শিখতে চায় তো আমরা বাধা দেব কেন। কিন্তু পরীক্ষার পড়া আগে করতে হবে অবশ্যই।"

"ঠিক এই জিনিসটাই আমি বলতে চাইছি। গরমের ছুটিতে সকাল-বিকেল চেপে পড়াশোনা করতে হবে। তারপর অবসর পেলে নেশার পিছনে ছোটো।" ঠিকঠাক বলতে পেরে মানসী খুশি হন মনে-মনে।

"ঠিক আছে, আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।"

"পরিষ্কার জানিয়ে দেবে পড়াশোনা ফেলে কোনও কিছু নয়। দু'-একটা খেলা শিখেছে বলেই দিগ্‌গজ হয়ে যায়নি। অমন তো কতজন কত কিছুই জানে। কিছু করতে পারে তারা জীবনে? এই তুমিই তো কত সুন্দর সেতার বাজাতে। কিছু হল ওই লাইনে?"

অলক আমতা-আমতা করেন, "মানে আমি তেমন করে ঝাঁপাতে পারিনি। গভীরভাবে কিছু চাইলে অবশ্যই হয়। আমি টুটুলকে বুঝিয়ে বলব লেখাপড়ার উপযোগিতা। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে প্রথমে ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।"

অলকবাবু যে তাঁর উদ্বেগ বুঝেছেন এতে আনন্দ হয় মানসীর। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর অলক ভাবেন, ছেলেকে নিয়ে বোধ হয় বেশি ভাবে মানসী। করে মানসী। তবে একথা ঠিক, পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে নিশ্চিতভাবে। অবহেলা করলে পরে ভীষণ মুশকিল হয়ে যাবে।

দোতলার ঘরে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে একমনে কী যেন পড়ছে টুটুল। অলকবাবু ধীর পায়ে গিয়ে ছেলের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন। নাঃ, পড়ার বই নয়, ছেলে তন্ময় হয়ে পড়ছে জাদুর বই। সচিত্র অদ্ভুত জাদুবিদ্যা।

গলাখাঁকারি দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে অলকবাবু বলেন, "তোকে একটা কথা বলি টুটুল।"

বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন একদম টেরই পায়নি টুটুল। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে অনুগত ভঙ্গিতে বাবার দিকে তাকায়।

অলকবাবু ছেলেকে ভালভাবে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "জাদু ব্যাপারটায় তোর খুব আগ্রহ হয়েছে তাই না?"

"ঠিক তাই।" টুটুল মাথা নিচু করে উত্তর দেয়।

"কিন্তু বি প্র্যাকটিক্যাল। এখন তোর ক্লাস টেন চলছে। জুন মাস। আর আট মাস পরে ফাইনাল পরীক্ষা। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করে, ম্যাজিক নিয়ে মাতামাতি কর।"

"ঠিক আছে বাবা।" টুটুল জাদুবিদ্যা বন্ধ করে পড়ার বই নামায়।

"কিন্তু এই যে অদম্য আগ্রহ এটা টিকিয়ে রাখতে হবে। তা হলে একদিন উন্নতি হবেই। আমার নিজের মনে হয় যদি কিছু ভাল লাগে, গভীরভাবে তবে তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু সেই জন্য এখন পরীক্ষার পড়ায় অবহেলা ঠিক নয়। আর ম্যাজিকের বইটই লাগলে নিশ্চয়ই কিনে দেব।"

•



"ঠিক আছে।" টুটুল বাবার কথা শুনে উৎসাহিত হয়েছে।

গঙ্গার ধারে 'ব্রজধাম' বাড়িটি বড় সুন্দর। পারের ঠিক পাশে বাগান আর তারপর অভিজাত তিনতলা বাড়ি। রাতে তো বটেই, নিস্তব্ধ দুপুরেও জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ শোনার মধ্যে অদ্ভুত এক শিহরন আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর টুটুল ছুটি কাটাতে মামাবাড়িতে এসেছে। কম করে মাসখানেক থাকবে বরানগরে ছুটির এই অবকাশে। বাড়িটা টুটুলের দাদু ব্রজেন্দ্রনাথ তৈরি করেছিলেন। যুদ্ধের বাজারে রঙের ব্যবসায় ভদ্রলোক প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। পরীক্ষা শেষের পর টুটুলের যখন কী করি কী করি ভাব, মা বললেন, "যা, একবার মামাবাড়িতে ঘুরে আয়। দিদা, ছোটমামা খুব আনন্দ করবে। আমিও কয়েকদিন পর যাব। দ্বিজেনের খবর কিছু পাওয়া গেল কি না তাও তো জানি না।"

টুটুল মাকে বলে, "বড়মামার আর কোনও খবর পাওয়া যাবে না। পাঁচ বছর হয়ে গেল, খবর পাওয়ার হলে এতদিনে নিশ্চয়ই পেতে।"

মা বলেন, "তবু যে তোর দিদা এখনও আশা ছাড়েনি।"

"সেটা একদিকে ভাল। মনে আশা আছে বলে দিদার শরীর ঠিক আছে না হলে ভেঙে যেত। তবে আমার মনে হয় বড়মামা সাধু হয়ে গিয়েছেন। সংসারে ফিরবেন না বলে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে এই যে সকলকে টেনশনে রেখে দেওয়া, এটা মোটেই সঠিক হয়নি। একটা খবর পাঠিয়ে দিলে সকলেই কেমন নিশ্চিন্ত থাকত।" ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর টুটুল নিজেকে বড় ভাবে, আর সেটাই ওর কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে খানিকটা অসচেতন ভাবেই।

মানসীদেবী বলেন, "দ্বিজেনটা বরাবরের অমন। কেমন যেন ভিতরগোঁজা, কথা বলতে চায় না। অনেক চাপাচাপি করলে তবে দু'-চারটে বাক্য বলে, কষ্ট করে। ফলে ওর মনোভাব বোঝা যায় না একদম।"

তিনতলার এক কোণে বড়মামার ঘরে দাঁড়িয়ে কথাগুলো মনে পড়ছিল টুটুলের। ঘরটা বেশ বড়। প্রায় সিলিং পর্যন্ত উঁচু কাঠের তিনটি আলমারিতে বই ঠাসা। টুটুল আগ্রহ নিয়ে বই নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে, যদি ওর নেশা ম্যাজিকের কোনও বই পাওয়া যায়। বেশিভাগ আধ্যাত্মিক বই, ভ্রমণের বইও আছে প্রচুর। বড়মামা বিস্তর ঘোরাঘুরি করেছেন। শোনা যায়, কী এক নেশা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত, ঘরে থিতু হতে দিত না। বোধ হয় নিজের বাউন্ডুলে স্বভাব তিনি ভালমতো বুঝতে পেরেছিলেন। বিয়ে-থা করেননি সেজন্য।

আলমারিতে তন্ত্র সংক্রান্ত কিছু বই টুটুলের চোখে পড়ে। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে মামা তন্ত্র ও তান্ত্রিক সম্পর্কে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। কে জানে অমন জীবনই বেছে নিয়েছেন কি না। বিশেষত, শেষবার ওঁর গন্তব্য ছিল গুয়াহাটি, শিলং এইসব জায়গা। গুয়াহাটির খুব কাছেই তো কামাখ্যা, তন্ত্রের স্বর্গরাজ্য।

বই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একটা বইয়ের দিকে টুটুলের নজর যায়। খুলে দেখে, সচিত্র জাদুবিদ্যা। লেখক রমণীমোহন চক্রবর্তী। কিন্তু খানিক উলটেপালটে বোঝে, একদম ছেলেখেলার বই। সে নিজে এর চেয়ে বেশি জানে। আর জাদুর নেশা সেই যে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় মোহনলাল ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, ব্যস পুরো জড়িয়ে পড়েছে ওতে। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত গুণী দু'-একজন। একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর দারুণ এক খেলা শিখেছিলেন, আংটি উধাও। জাদুকর বাউড়িয়ায় থাকেন, নাম খগেন খাঁড়া। যশ, প্রতিষ্ঠা নেই, কিন্তু সত্যি চমৎকার খেলা দেখান ভদ্রলোক। আর সবচেয়ে বড় কথা, টুটুলকে প্রচণ্ড স্নেহ করেন। না হলে কে আর খেলা শেখাতে চান। এমন করেই নতুন-নতুন খেলা শিখতে হবে টুটুলকে, জানতে হবে ম্যাজিকের অনেক কিছু।

দোতলার এই ঘর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। সকালবেলা আর প্রাক সন্ধের মুহূর্তে চারপাশের পৃথিবী সব মালিন্য ঝরিয়ে ফেলে ঝলমল করে ওঠে। শেষ বিকেলের রঙে রেঙে উঠেছে চারধার। এই বাড়িতে প্রচুর গাছ, কিচিরমিচির করে পাখিরা সন্ধের সময় বাসায় ফিরে আসছে। জানলার ধারে টুলে বসে তন্ময় হয়ে সন্ধে নামা প্রকৃতি দেখছে টুটুল। হঠাৎ দৃশ্য উপভোগে বাধা পড়ে। আলমারিতে বইয়ের মধ্যে বড়সড় এক খাতা চোখে পড়ে। টুল ছেড়ে এসে টুটুল আলমারি খুলে ফেলে। কোনও আলমারিতেই তালা নেই। আর টুটুলের তো মামাবাড়িতে অবারিত দ্বার।

খাতা খুলে দ্যাখে তার ভিতর গোটা তিনেক ম্যাপ, একটা কম্পাস। এই খাতায় দিনলিপির মতো কিছু লেখা আছে। প্রথম ম্যাপ খুলে দেখা যায়, অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডিটেল্‌সে দেখানো আছে। খাতার পাশেই লম্বা একটি বই হাতে তুলে দ্যাখে, ম্যাজিক অফ রবার্ট হারবিন। বইটির মুখবন্ধে লেখা আছে মোটে একশো কপি এই বই ছাপা হল কেবলমাত্র ম্যাজিকে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য। এই বইয়ের কোনও অংশই কোনওভাবে ছাপা, অনুবাদ ইত্যাদি করা যাবে না। তলায় হারবিনের সই ছাপা। বইয়ের প্রথম পাতায় বড়মামার নাম সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর পঁয়ষট্টি।

বইটা হাতে নিয়ে টুটুলের আনন্দ ধরে না। ম্যাজিশিয়ানদের কাছে এই বই সোনার খনি এবং মাত্র একশো কপি ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে ভারতে ক'টা কপি এসেছে কে জানে! এমনও হতে পারে, একমাত্র কপিটাই এখন টুটুলের হাতে। উত্তেজনায় গা শিরশির করে ওর।

গত এক সপ্তাহে টুটুলের বার তিন পড়া হয়েছে হারবিনের বই। তবু যেন অনেক কিছু বোঝা যায় না। কোনও সুদক্ষ ম্যাজিশিয়ান বুঝিয়ে দিলে যেন ভাল হয়। কত নতুন কিছু শেখা যাচ্ছে, অজানা এক জগতের দরজা যেন খুলে দিচ্ছে এই বই। এর আগে কলেজ স্ট্রিট থেকে একটি ম্যাগাজিন কিনেছিল ম্যাজিক সম্পর্কে। সেটা পড়েও প্রচণ্ড আনন্দ পেয়েছে, তবে এখনকার অনুভূতির কাছে তা কিছু নয়। তবে সেই ম্যাগাজিন থেকে সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অফ ম্যাজিশিয়ানদের ঠিকানা। এর হেড অফিস সেন্ট লুইস, মিশর, আমেরিকা। সেই ঠিকানায় চিঠি লিখে ওই সংস্থার সভ্য হয়েছে টুটুল। ওরা ওকে ওদের প্রকাশিত বই নিয়মিত পাঠায়। গত ক'বছর এই সব দারুণ বই পড়ে-পড়ে ও ম্যাজিকের অনেক কিছু জেনেছে। অনেকের সঙ্গে চিঠির আদানপ্রদানও হয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের

ফ্লয়েড জি থিয়ার্স্ক সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, টুটুল যদি কোনও শো করে তবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য দ্বিধাহীনভাবে তাঁকে জানাতে। ম্যাজিকের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি সবই পশ্চিমে। কাজেই সেখানকার বিখ্যাত মানুষের প্রতিশ্রুতি পেয়ে টুটুল উত্তেজিত। এখন আই এ পরীক্ষাও হয়ে গেল, ফলে বাড়িতে বাবা আর লেখাপড়ার জন্য চাপ দেবেন না। এবার মনের সুখে সে কাজে নামতে পারে।

একদিন কাগজে বড় এক বিজ্ঞাপন দেখে টুটুল চমকে যায়। নিউ এম্পায়ারে ভারতশ্রেষ্ঠ জাদুকর মোহনলালের জাদু-প্রদর্শনী। সব খেলাই নতুন, এদেশে এই প্রথম।

বিজ্ঞাপন দেখে টুটুল ভাবে, সেই মোহনলাল নন তো? স্কুলে যাঁর খেলা দেখে সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। টিকিটের ভীষণ চাহিদা, তৃতীয় দিনের আগে টুটুল শো দেখতে পায় না।

সাফল্য চেহারার রূপান্তর ঘটিয়েছে। তবু বোঝা যায় স্কুলে দেখা সেই মোহনলালই আজকের স্বঘোষিত ভারত শ্রেষ্ঠ জাদুকর মোহনলাল।

আজকের শো পুরো হাউসফুল। মহাজাতিসদনে মোহনলালের শো শুরু হয়েছে তিন দিন। প্রতিটি শো-তেই হল ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। টুটুল সামনের দিক থেকে ঠিক তিন নম্বর রো-তে বসে খেলা দেখছে নিবিষ্ট মনে। মোহনলাল ম্যাজিক দেখাতে-দেখাতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। টুটুল জানে, এটা জাদু দেখানোর এক কৌশল। কথার মায়াজালে মুগ্ধ দর্শক জাদুকরের হাতের দিকে তাকাবেই না। ম্যাজিক তো আসলে অনেকটাই হাতের কারসাজি এবং নানা যন্ত্রের সঠিক প্রয়োগ।

মোহনলাল প্রচুর নতুন খেলা দেখাচ্ছেন। জীবন্ত মানুষকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করে ফের তাকে হাজির করছেন স্টেজে। এই খেলা দেখে দর্শকরা খুব তারিফ করল। টুটুল জানে, এই খেলা প্রথম দেখিয়েছিলেন পি টি সেলবিট। তিনি এই খেলার উদ্ভাবক। পরে আমেরিকার হাওয়ার্ড হার্সটন, যাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর বলা হয়, তিনি এই খেলা দেখাতেন। কিন্তু মোহনলাল যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় রেখেছেন এই ম্যাজিকে, তা অবিশ্বাস্য। নিজস্ব আঙ্গিক এবং মঞ্চশিল্পের উপর অসাধারণ জ্ঞান এই খেলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এর পরের খেলা জাদুকর অদৃশ্য। স্টেজে কথা বলতে-বলতে দুম করে একটা আওয়াজ হয়। তারপর ধোঁয়া সরলে দেখা যায় মোহনলাল স্টেজে নেই। তুমুল হাততালির মধ্যে জাদু প্রদর্শনী শেষ হয়।

তবু এই খেলা দেখে টুটুলের মন ভরে না। ওর মনে পড়ে যায়, বরানগরে বড়মামার ঘরে পাওয়া ম্যাজিক অফ রবার্ট হারবিন বইয়ের কথা। সেখানে জাদুকরের অদৃশ্য হওয়ার কথা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। লেখক বলছেন, 'জাদুকর মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে যদি প্রেক্ষাগৃহের অন্য জায়গা বা একদম বাইরে দেখা দেন তবে খুব ভাল প্রতিক্রিয়া হবে দর্শকদের মধ্যে।' কিন্তু মোহনলাল যে অদৃশ্য হয়ে আর ফিরে আসছেন না!

"তোমার যে আমার ম্যাজিক ভীষণ ভাল লেগেছে এবং শেষ খেলাটা তত মনে ধরেনি বলে যে চমৎকার সাজেশন দিয়েছ, সেই জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আর বইটার তো জবাব নেই। এত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছে ব্যাপারটা, স্টেজে দেখাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। বইটা আমার খুব কাজে লেগেছে।"

"তাই নাকি?" মোহনলালের কথায় টুটুল উল্লসিত।

"নিশ্চয়ই। অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে আসায় দর্শকরা একদম অভিভূত হয়ে পড়েছে। এই ইমপ্যাক্টটা কিন্তু প্রথম দিকে পাইনি। দ্যাখো, অনেকেই তো ম্যাজিক দেখে কিন্তু সত্যিকারের আগ্রহ তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু শুধু আগ্রহ থাকলেই হয় না, অধ্যবসায়, অনুশীলন এসবের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে জাদু প্রদর্শনে। তবে বইটা তো তোমার চাই?"

"ওটা আমার বই নয়। বড়মামার বই।" জাদুকর বই ফেরত দিতে চাওয়ায় টুটুলের গলায় স্বস্তি।

"সেটা দেখেছি, প্রথম দিকে নাম লেখা আছে। তবে বইটা তোমায় দেওয়ার আগে একটা ছোট পরীক্ষা করতে চাই। বলতে পার বুদ্ধির পরীক্ষা। বইটা সরাসরি তোমায় দিচ্ছি না। শুধু এটুকু বলছি যে, এই ঘরেই আছে। তুমি মাথা খাটিয়ে খুঁজে নাও। আর যদি না পার, তবে তুমি হার স্বীকার করলেই আমি বইটা তোমার হাতে তুলে দেব।"

মোহনলালের কথা শুনে টুটুল মনে-মনে ভড়কে যায়। তবে কি ওঁকে শেষ খেলা সম্পর্কে বলা ভুল হয়েছে? ওঁর ত্রুটি দেখাতে উনি ভিতরে-ভিতরে রেগে গিয়ে টুটুলকে এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিলেন? কে জানে! বিখ্যাত মানুষদের বিচিত্র খেয়াল থাকে, এও বোধ হয় তেমন।

দোতলার এই ঘরটি বেশ বড়। কাঠের আলমারিতে প্রচুর বইপত্র আছে। একপাশে বড়-বড় তিনটে প্যাকিং বাক্স। ওগুলোয় মনে হয় ম্যাজিকের সরঞ্জাম আছে।

"ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা করো আমি ততক্ষণ একটু কাজ এগিয়ে রাখি।" কথাটা বলে মোহনলাল কোণের টেবিলে বসে লিখতে থাকেন।

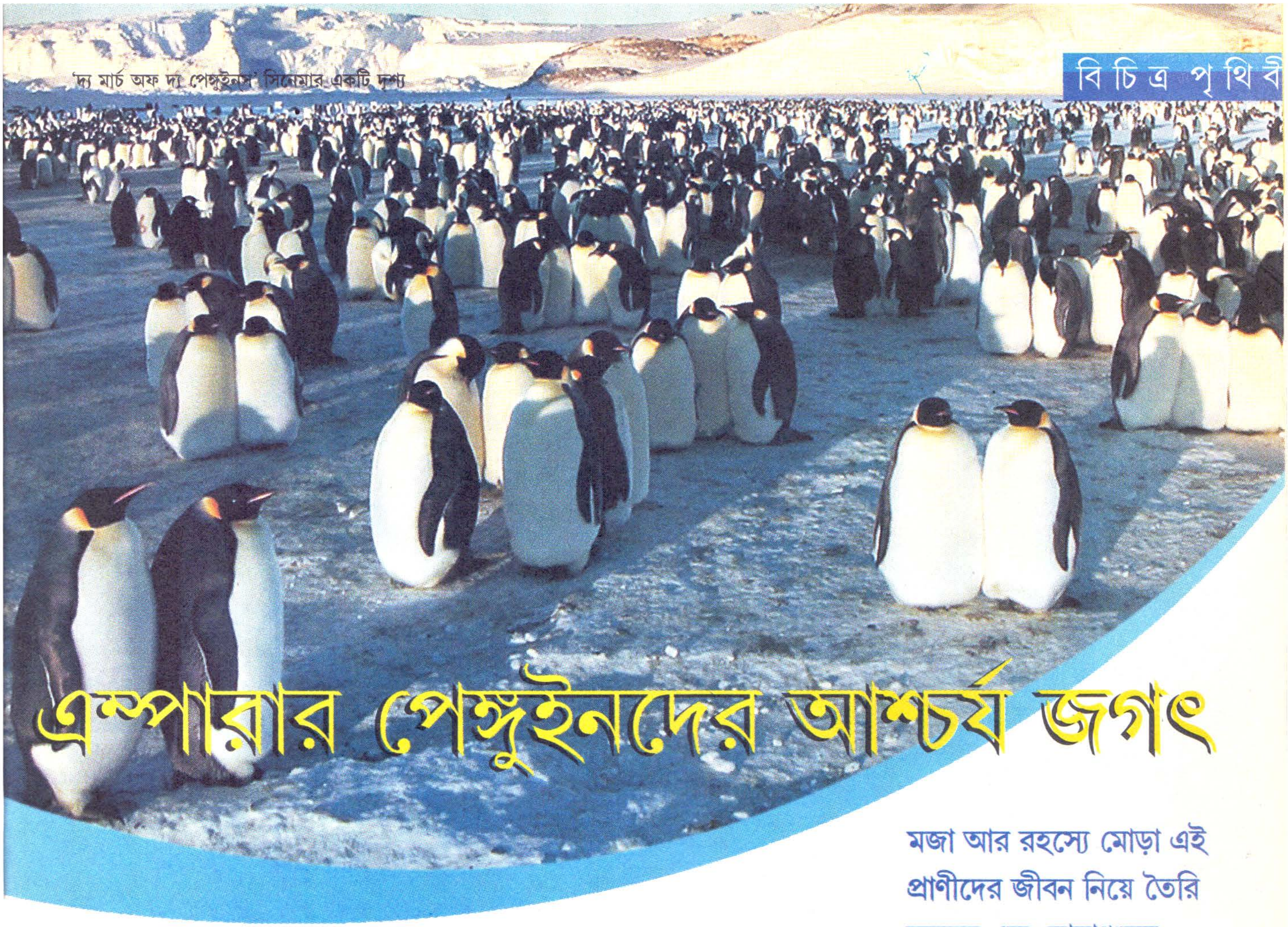
টুটুল মনে-মনে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে অস্থিরভাবে গদি আঁটা টুলে দুলতে থাকে। দু'-চারবার দোলার পর টুলটা কেমন যেন লগবগ করতে থাকে। টুটুল ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে পায়, গদিওলা বসার জায়গার তলায় লোহার এক মোটা পায়া লাগানো। সেই পায়ার উপর প্যাঁচ এঁটে বসার জায়গা তৈরি হয়েছে। প্যাঁচটা ঘোরাতে গদিটা খুলে আসে আর ভিতরে একটা খোপ বেরিয়ে পড়ে। বাহ, এমন খোপে তো অনায়াসেই বই লুকনো যায়।

চিন্তার সূত্র থেকে টুটুল দ্বিতীয় টুলটার প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে ফেলে। ভিতরের খোপে রবার্ট হারবিন ম্যাজিক বইটি অক্ষত অবস্থায় দেখে আশ্বস্ত হয়।

টুটুলের বুদ্ধির কেরামতিতে মোহনলাল প্রসন্ন। হাসিমুখে বলেন, "বাহ, আগ্রহের সঙ্গে তোমার দেখছি বুদ্ধিও আছে। এখন দরকার শুধু নিয়মিত অনুশীলন আর অধ্যবসায়। তা হলে তুমি ম্যাজিককে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।"

টুটুল অগ্রজ জাদুকরকে প্রণাম করে।

ছবি: দেবাশিস দেব


'দ্য মার্চ অফ দ্য পেঙ্গুইনস' সিনেমার একটি দৃশ্য

এম্পারার পেঙ্গুইনদের আশ্চর্য জগৎ

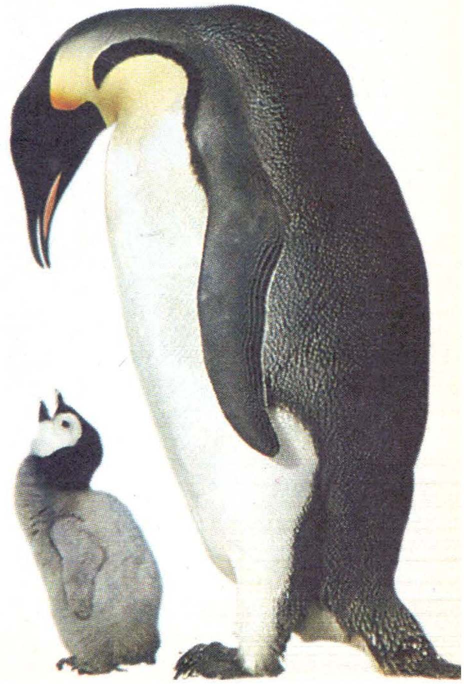
মজা আর রহস্যে মোড়া এই প্রাণীদের জীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে এক রোমাঞ্চকর তথ্যচিত্র। জানিয়েছেন অভিজিৎ সুকুল

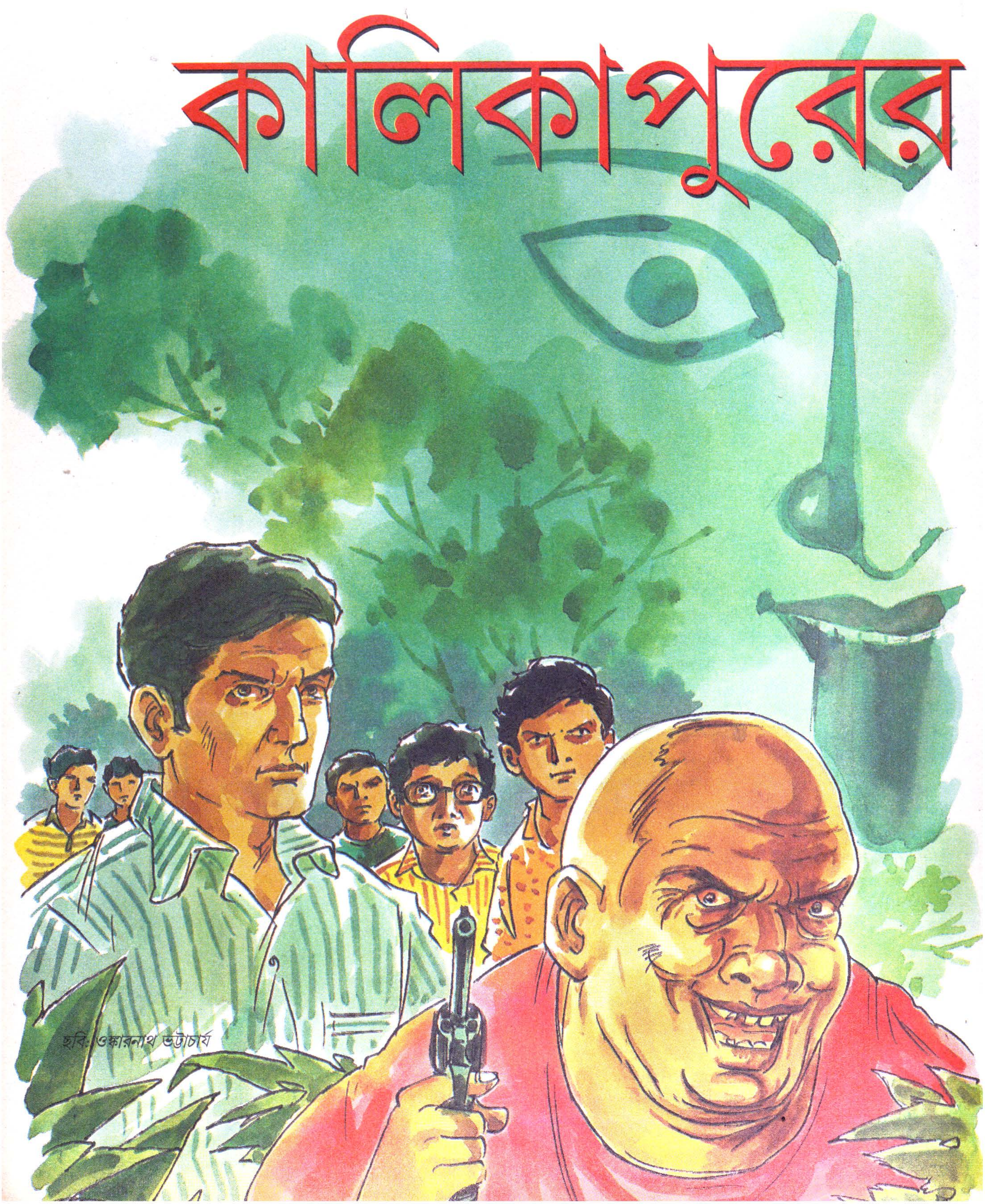
ঠান্ডা, রুক্ষ, অন্ধকারময় এক মহাদেশ। বিখ্যাত অভিযাত্রী আর্নেস্ট শ্যাকেলটনের ভাষায় আন্টার্কটিকা তো এরকমই। আয়তনে ইউরোপের চেয়েও বড় এই মহাদেশে প্রতি বছর শীতকালে আন্টার্কটিকার উপকূলে বংশবৃদ্ধির জন্য বাসস্থান ছেড়ে দলে-দলে এম্পারার পেঙ্গুইনরা চলে যায় বরফ-সমুদ্র আন্টার্কটিকার অভ্যন্তরে। এই নিয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার সহযোগিতায় সম্প্রতি তৈরি হয়েছে এক তথ্যচিত্র, 'দ্য মার্চ অফ দ্য পেঙ্গুইন্স'।

পরিচালক লিউক জ্যাকেট জানাচ্ছেন, অন্য যে-কোনও সিনেমার মতো এ-ছবিও, মজা আর রহস্যে মোড়া। অভিনেতারা পেঙ্গুইন হলে কী হবে, তাদের জীবনটাও যে এমন আবেগে আর মমতায় ভরা, তাদের জীবনেও যে এত সংগ্রাম, তা কে জানত! ছবির গল্পটা পুরোটাই বলা হয়েছে পেঙ্গুইনদের বকলমে। ধারাভাষ্য দিয়েছেন হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা মর্গ্যান ফ্রিম্যান।

ছবির গল্প এরকম—দক্ষিণ গোলার্ধে সব মিলিয়ে প্রায় লাখচারেক পেঙ্গুইনের বাস। এদের সতেরোটি প্রজাতির মধ্যে এম্পারার পেঙ্গুইন অন্যতম। আন্টার্কটিকার উপকূলে ওরকা, লেপার্ট সিলের মতো প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচতেই প্রত্যেক শীতের শুরুতে ডিম পাড়ার আগে এরা দল বেঁধে চলে যেতে থাকে মহাদেশের ভিতরে। মিছিল করে বেশ কয়েকদিন পর গন্তব্যে পৌঁছে ডিম পাড়ে মা-পেঙ্গুইনরা। সেই ডিমে তা দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু পুরুষদের। প্রচণ্ড ঠান্ডা (তাপমাত্রা প্রায় মাইনাস ৫৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) ও প্রবল হাওয়া (প্রায় ১০০-১৫০ মাইল গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায়) উপেক্ষা করে বাবা-পেঙ্গুইনরা থেকে যায় ওখানেই। এ-সময়টা সম্পূর্ণ উপবাসে কাটায় তারা। মায়েরা চলে আসে সমুদ্রের ধারে, খাবারের সন্ধানে। প্রায় মাসদু'য়েক পর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরনোর সময় ফিরে আসে মা-পেঙ্গুইনরা। বাচ্চাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব তখন তাদের। বাবা-পেঙ্গুইন সেসময় যায় খাবারের সন্ধানে। এভাবে বাচ্চার খাবার জোগাড় করতে বাবা-মা'র পালাক্রমে যাতায়াত চলে প্রায় সাত বার। পেঙ্গুইনদের এই ভিড়ে শিশু-পেঙ্গুইন সামান্য গলার আওয়াজেই ঠিক চিনে নিতে পারে নিজের বাবা-মা'কে।

শীত শেষ হলে, বাচ্চারা যখন বড়সড় হয়ে ওঠে, তখন আবার মিছিল করে নিজেদের বাসস্থানে ফিরে আসে সুখী পেঙ্গুইন পরিবার।




কালিকাপুরের
ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য



উল্কা

সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

মানুদা এসেছে এই খবরটাই যথেষ্ট। ছ'জন পড়ি-কী-মরিভাবে ছুটে ডা: সুরেশ রায়ের বাড়ির দিকে ধাওয়া করলাম। মানুদা অর্থাৎ মানস রায়, ডা: রায়ের ছোট ভাই। আমাদের চেয়ে বছর চারেকের বড়। অসম্ভব মেধাবী ছাত্র। আমাদের স্কুলের গৌরব। কম্পিউটার-টেকনোলজি পড়ছে আই.আই.টি'তে। পরীক্ষা দিয়ে ফিরেছে। এরপর নাকি সিড্‌নি যাবে সরকারি স্কলারশিপ নিয়ে। একমাস ছুটিতে এসেছে। আমরা ছ'জন ভীষণ স্নেহের পাত্র মানুদার। ডা: রায়ও আমাদের খুব ভালবাসেন। আমি সুমে—সুমিত ব্যানার্জি। আমার অন্য বন্ধুরা হচ্ছে নেরু—নরেন ঘোষ, বাঘা—বিবেক মজুমদার, নন্তু—নবনীত বসু, ভুতো—ভবতোষ দত্ত এবং পিতু মাল। আমরা এসেই চলে গেলাম মানুদার ঘরে। মানুদা, ভাইপো তাতুন ও বউদির সঙ্গে কথা বলছিল। ডা: রায় এখন তাঁর চেম্বারে। আমাদের দেখেই মানুদা বলে উঠল, "আয় আয়। আসার পরই পিতুর বাবা পরানকাকুকে দিয়ে তোদের খবর পাঠিয়েছিলাম।"

তাতুনের মা সোহিনীদেবী আমাদের দিকে হেসে বললেন, "আর তো আমার কোনও কথা চলবে না, তোমরা সব এসে গেছ। আমি আসছি মানু, তাতুন থাকল। চা-জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাও, সকাল থেকে এদের কথা বলছিলে, এবার কথা বলো।" সোহিনীদেবী বেরিয়ে গেলেন।

ন'বছরের তাতুন বলল, "জানো কুকু, পিতুদাদা এবার ক্যারাটে কম্পিটিশনে রানার্স আপ হয়েছে।"

পিতু মাথা নামাল। মানুদা বলল, "সে কী রে? আমি তো ভেবেছিলাম তুই চ্যাম্পিয়ন হবি?"

আমি বললাম, "ওরই তো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা। জাজেরা দু'নম্বরি করেছে। পয়েন্টে হারাল ওকে। ওর অপোনেন্ট ছিল বর্ধমানের মদন সেন। বিরাট ব্যবসায়ীর ছেলে। অন্যায়ভাবে পিতুকে হারানো হল। আর পিতুও যেমন! নক্‌-আউট করার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিল।"

মানুদা মৃদু হেসে বলল, "কী রে পিতু। সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলি?"

পিতু তার স্বভাবসুলভ লজ্জার হাসি দিয়ে বীরভূমি ভাষায় বলল, "আমার গুরু বরেনকাকা বুল্যাছিল ইটো জীবন-মরণ লড়াই লয়। ইটো খেলা আছে বটে। আমি ভাল করে মারলে উ অজ্ঞান হন পড়ি যেত। আমি সুযোগ পেয়্যাছিলাম। মারি নাই।"

মানুদা হেসে বলল, "থাক, যা হওয়ার হয়েছে। পরেরবার ভাল করে চেষ্টা করিস।"

এবার শুরু করল নেরু, "আচ্ছা, যা হওনের তা হইসে গিয়া। অহন কও, তোমার কথা আসিল তোমার পরীক্ষা হইয়া গেলে আমরা একসাথে বেড়াইতে যামু। অহন তোমার পরীক্ষা হইয়া গেসে, আমাদেরও। সব ঠিক কইরা ফেলা যাক।"

বাঘাও ফাটা রেকর্ড চালাল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার কো-কোথাও বেড়াতে যে-যে-যেতে হয়...।"

নন্তু তাকে থামিয়ে বলল, "এক্ষুনি সব ঠিক করে ফেলা যাক।"

ভুতো আমাদের মধ্যে সেরা ছাত্র, ফার্স্ট হয়। সে বলল, "গতবার তুমি কালিকাপুর, না কোথাকার নাম বলেছিলে না?"

মানুদা হেসে বলল, "তোর ঠিক মনে আছে দেখছি। সিউড়ি থেকে যেতে হয়। এখন ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পড়ছে। দেহাতি জায়গা। এখন বোধ হয় বিদ্যুৎ যোগাযোগ হয়েছে। আগে তাও ছিল না। কোনও টেলিফোন সংযোগ নেই। অনেক সাঁওতালের বাস। সভ্যতার দিক থেকে ওইসব অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জিনিসটিনিস ভীষণ সস্তা। মানুষজনও খুব ভাল। ওখানকার পরিবেশ অন্যরকম। আশা করি তোদের খারাপ লাগবে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "যা বলছ, তাতে ওখানে হোটেল বা ওই ধরনের কিছু থাকার সম্ভাবনা তো নেই মনে হচ্ছে। উঠব কোথায়?"

মানুদা বলল, "ওখানে দাদার চেনা এক বন্ধু আছেন। বংশানুক্রমিকভাবে ওই অঞ্চলের রাজা। এখন অবশ্য আর রাজা বলা উচিত হবে না। তবে ওখানকার লোক এখনও রাজাসাহেব বলেই ডাকে। ভাল অবস্থা। উনি একবার এক সাংঘাতিক রকমের শারীরিক সমস্যায় পড়েছিলেন। এখন-তখন অবস্থা। দাদা তখন কলকাতার পিজি হাসপাতালে ছিলেন। দাদাই অপারেশন করে ওঁকে বাঁচান। আর নাকি ঘণ্টাখানেক দেরি হলেই, উনি মারা যেতেন। সে আজ থেকে বছরছ'য়েক আগের ব্যাপার। এরপর থেকে দাদার সঙ্গে ওঁর গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। উনি আমাদের এখানেও এসেছেন কয়েকবার, দাদা চাকরি ছেড়ে এখানে আসার পর। আমার সঙ্গে ভাল আলাপ আছে। ওঁর একটি ফুটফুটে ছোট মেয়ে আছে, নাম রানি। এক ছেলেও আছে, যে বিদেশে পড়াশোনা করে। বছরতিনেক হল ওঁর স্ত্রী হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর থেকে যোগাযোগ কমে গেছে। আমি কলকাতা আসার পরই ওঁকে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি পাঁচদিন হল, আমরা যাচ্ছি কালিকাপুরে। ফোনের তো কোনও ব্যবস্থা নেই ওখানে, মোবাইলেও কোনও টাওয়ার পাওয়া যাবে না। তাই তোদের সঙ্গে



কথা বলার আগেই সব ব্যবস্থা করেই রেখেছি।"

আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। নন্তু বলে উঠল, "ওখানে তো বোধ হয় রেললাইনও নেই। শুনেছি নাকি কয়েকটা ঝড়ঝড়ে বাস চলে। আমরা যাব কিসে?"

এবার মুখ খুলল বাঘা, "কে-কে-কেন, ডাকতারবা-বা-বুর ব-ব-বড় গা-গা-গা...।"

তার মুখ থেকে কথা ছিনিয়ে আমি বললাম, "মানুদা, তুমি বললেই তো ডাক্তারবাবুর বড় টয়োটা জিপটা পাওয়া যেতে পারে?"

মানুদা মুচকি হেসে বলল, "সে-ব্যবস্থাও হয়ে আছে। দাদা পারলে নিজেও যেতেন। দাদার চেয়ে বয়সে বড় হলেও তিনি অনেক দিনের বন্ধু কিনা? আমি কালিকাপুর যাব শুনে নিজেই বললেন, 'ওখানকার রাস্তাঘাট ভাল না, জিপটা নিয়ে যাস।' আমরা এবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। বুঝলাম, মানুদার মাথায় আমাদের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে।"

আবার ঢুকলেন তাতুনের মা সোহিনীদেবী, সঙ্গে একরাশ এগরোল আর কফি। বললেন, "নাও, সব আলাদা-আলাদা করে তুলে নাও। মানু এতদিন পর এল, কোথায় ক'দিন আরাম করে কথা বলব, তা নয়, আবার কোথায় বেড়াতে যেতে হবে।"

মানুদা বলল, "বউঠান, ও তো দিন পাঁচ-সাতেক..., তারপর তো চলে আসব। তা ছাড়া রানিও এতদিনে বোধ হয় বছর দশ-এগারো হয়ে গেছে। তুমি দ্যাখো, তুমিও যাবে কি না?"

তিনি হেসে বললেন, "গেলে তো ভালই লাগত। কিন্তু, তুমি তো জানো, তোমার দাদার জন্য কোথাও বেরোতে পারা যাবে না। দেখি, তোমরা ঘুরে এসো। সূর্যকান্তবাবু ভীষণ কালীভক্ত। এক বিশাল দিঘির মাঝখানে জলের উপর শ্মাশানকালীর মূর্তি আছে, এক মন্দিরের মধ্যে। দিঘির জলে নাকি বহুদিনের পুরনো সব মাছ খেলে বেড়ায়। বিরাট বড়-বড় মাছ। তাদের নাকি আলাদা-আলাদা নাম আছে। নাকে দামি পাথরের নথ আছে। কালীমন্দির তাঁর পূর্বপুরুষ কেউ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। সেই দিঘির চারপাশের জমি অসম্ভব রকমের উর্বর। অনেক ফসল ফলে সেখানে। কখনও সার দিতে হয় না। এক-একটা নারকোলই হয় সাধারণ নারকোলের চেয়ে অন্তত দেড়গুণ সাইজের। সবই শোনা তোমার দাদার কাছ থেকে, আমি কখনও যাইনি সেখানে। সূর্যকান্তবাবু অবশ্য আমাদের কাছে আসার পর অনেকবার অনুরোধ করেছিলেন যেতে। আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তোমরা ঘুরে এসো। পরে দেখি, আমারও একবার যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে আছে।"

বাইপাস ধরে আমরা জগধারী নিত্যানন্দ মহামঠ ডান পাশে ফেলে এগিয়ে চললাম, সুপার হাইওয়ের দিকে। এই রাস্তাটা নতুন হয়েছে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায়। বিশাল চওড়া। ঝকঝকে রাস্তা। দু'পাশে পাকা ধানের খেত। সোনালি ধানে মোড়া। এই রাস্তা হওয়ার পরে নলহাটি থেকে দুর্গাপুর এবং অন্য দিকে বহরমপুর ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ অনেক সুবিধেজনক হয়েছে। এ-কথা সাধারণ মানুষকে আর কে বোঝায়? তারা চকচকে রাস্তা পেয়ে তার উপর ধান শুকোতে দিচ্ছে রাস্তার অর্ধেক জুড়ে। এতে রাস্তা ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার উপর আবার বড়-বড় পাথর ফেলে ধান শুকোবার জায়গা গার্ড দেওয়া হচ্ছে। এতে দুর্ঘটনা ঘটবে না তো কী হবে? এত সুন্দর রাস্তা অথচ গ্রামবাসীদের অপরিণামদর্শিতার ফলে তা হয়ে উঠেছে 'যমের দুয়ার'। রোজই দুর্ঘটনা ঘটছে। অনেকে মারা যাচ্ছে। অনেক লেখালিখিও চলছে। কবে যে কর্তৃপক্ষের নজর পড়বে কে জানে? আমাদের গাড়ি ব্রাহ্মণী নদীর সেতু পেরোতেই মানুদা স্টিরিও অন্ করল। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেলা গলায় বেজে উঠল, "আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন ওহে কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার...।"

রামপুরহাট, গণপুর পেরিয়ে আমাদের গাড়ি মহম্মদবাজারের দিকে এগিয়ে চলল। আর-একটা কথা আমাদের সম্বন্ধে বলা হয়নি, তা হল নন্তুর হ্যাভারস্যাক। কী থাকে না এই ব্যাগে তা আমাদের জানা নেই। যখন যা দরকার পড়বে তা পাওয়া যাবে নন্তুর বিখ্যাত ব্যাগে। আমরা যখন যেখানে গেছি, নন্তু তার ব্যাগের জন্য আমাদের কতটা সাহায্য করেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এর মধ্যেই তার ব্যাগ থেকে দুটো কোল্ড ড্রিঙ্কসের ক্যান বেরিয়েছে, বাঘা আর পিতু বলেছিল তাদের তেষ্টা পেয়েছে।

গণপুরের পাশ দিয়ে যেতে বড়ই ভাল লাগে। দু'পাশে বড়-বড় শালগাছের সারি। গভীর জঙ্গল, যার বেশিরভাগই শালগাছ দিয়ে ভরা। আজকাল এই শালগাছও অন্যায়ভাবে কাটা হচ্ছে। জানি না আর কতদিন এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে পাব? তিলপাড়া সেতু পেরিয়ে আমরা সিউড়ির দিকে চললাম। হাসপাতাল ডান দিকে ছেড়ে আমাদের গাড়ি ডি এম-এর অফিস ছাড়িয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে চলল। এবার আমাদের পশ্চিম দিকে যেতে হবে। সামনে পড়ল 'বংশীধরের মোরব্বা'র দোকান। রাস্তার বাঁ পাশে এনে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হল। মানুদা নেমেই বলল, "সিউড়িখ্যাত মোরব্বার দোকান। চল, ঢুকে পড়া যাক।" বেল, শতমুলি, আপেল, ফুলকপি, পেঁপে, যত রকমের মোরব্বা আছে আশ মিটিয়ে খাওয়া হল। সবচেয়ে বেশি খেল নেরু। মানুদা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল, "দারুণ, বেশ লাগল। অনেকদিন পর মোরব্বা খেলাম।"

নেরু বলল, "অনেক খাইয়া ফ্যালাইলাম। আর খাওন লাগব না। প্যাট অ্যাক্ক্যারে ঢাক হইয়া গ্যাসে।"

বেলা গড়াতে লাগল, আমরা 'পাতাবাহার' পেরিয়ে সামনে চলতে লাগলাম। দু'পাশে উঁচু-উঁচু টিলা। রাস্তার দু'পাশে গাছপালা। রাস্তা বেশ খারাপ, খাল-ঢিপ, তার উপর রয়েছে ছাগল-গোরুর উৎপাত। রাস্তা জুড়ে গোরু বসে থাকছে, হর্ন দিলেও নড়ার নাম নেই। পিতু মাঝে-মাঝে নেমে 'হেট-হেট' করে তাদের তাড়াচ্ছে। সাঁওতাল পুরুষ-মহিলা দলবেঁধে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে হাটের দিকে যাচ্ছে। তাদের পিছনে চলেছে পোষা কুকুরের পাল। আমাদের গাড়ির আওয়াজে তারা বিরক্তিসূচক ধমক মারছে। মানুদা ভালই গাড়ি চালাচ্ছে। তবে এই বাজে রাস্তায় গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা যে খুব সুখের হচ্ছে না তা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ মানুদা সাংঘাতিক জোরে ব্রেক কষল। আমরা সবাই সামনে হুমড়ি খেয়ে কোনওমতে সামলালাম। মানুদার মুখে বিরক্তিসহ স্বগতোক্তি শুনলাম, "যত্ত সব!"

বাঁদরের বাঁদরামি

গাড়ি সজোরে থামার পর দেখি, গাড়ি থেকে হাততিনেক দূরে রাস্তার মাঝখানে তিনটে শুকরের বাচ্চা, কাত হয়ে শুয়ে থাকা মা-

শুকরটার দুধ খাচ্ছে পরম আনন্দে। জোরে-জোরে হর্ন বাজাবার পর তারা যেন অনেক কষ্টে সরে গেল। রাস্তার পাশে একটা বড় লাইন-হোটেল। এখানে এই ধরনের হোটেলকে 'ধাবা' বলে। ধাবার সামনে একটা বড়সড় আমগাছ। তার গায়ে একটা কালো মোটরসাইকেল ঠেস দেওয়া আছে। চারপাশে অনেক চৌকিপাতা আছে। সেখানে বসে অনেক দেহাতি মানুষ দুপুরের খাবার খাচ্ছে। কেউ-কেউ বা চা-রুটি খাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে ফিসফিস করে কথা বলছে। আমার খুব অদ্ভুত লাগল। কারণ, দেহাতিরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে, তখন মনে হয় চিৎকার করছে। ভীষণ উঁচু স্বরে এরা গল্প করে নিজেদের মধ্যে। আমার কেমন যেন অবাক লাগল ওদের স্বরের মাত্রায়। পিতু তার নিজস্ব বীরভূমি ভাষায় বলল, "দাদা গো, হেই ধাবাগুলানে চা করে বড় ভাল। চলো ক্যানে, সবাই মিলে এটটু চা খেঁই লিই।"

আমাদের সবারই মনে ধরল তার কথা। মানুদা গাড়িটা একটু এগিয়ে বাঁ পাশে রাখল।

মানুদা হাতের ইশারায় ধাবার মালিককে ডাকল। আমরা নেমে দুটো চৌকিকে একসঙ্গে জুড়ে সবাই মিলে বসলাম। ধাবার মালিক এক নধরকান্তি দেহাতি। পরনে খাটো ধুতি ও সাদা ফতুয়া। বাঁ গালটা মোটা। বোধ হয় খইনি ভরা আছে। ঠোঁটের উপর বিশাল কাঁচা-পাকা বাহারি গোঁফ। ধাবামালিক এগিয়ে এসে ফিসফিস করে মানুদাকে লক্ষ করে বলল, "বলিয়ে মালিক, ক্যা সেবা করে?"

মানুদা বলল, "বঢ়িয়া করকে সাত গ্লাস চায় বানাকে লাইয়ে।"

মালিকের সাদাকালো খইনির ছোপধরা দাঁত এবার দেখা গেল। একগাল হেসে যথাসম্ভব নিচু স্বরে বলল, "জরুর সাহাব। একদম ইস্পিসল চায় হোগা। এরপর একবাত বাবুজি। আপ সাতলোগ হ্যাঁয়, হল্লা মত করিয়েগা। উধর দারোগাসাহাব আউর কনস্টেবলসাহাব গহেরা নিদ মে শো রহে হ্যাঁয়। দারোগাসাহাব বহুত কড়ক মিজাজকা আদমি। নিদ টুটনে সে আফত হো যায়েগা। দেখিয়ে না আউর সবলোগ ভি ফিসফাস বাত কর রহে হ্যাঁ। শোর কোই নেহি কর রহা।"

এই বলে মালিক টালির ছাউনি দেওয়া বাঁশের খাঁচায় তৈরি বিশাল ধাবার ভিতরে চলে গেল। সেখানে বিরাট বড় চারকোনা চুল্লি, তাতে গনগন করছে আঁচ। দু'জন রাঁধুনি বসে রুটি, মাংস, তরকারি ইত্যাদি তৈরি করছে।

মানুদা বলল, "এদের এখানে রাঁধুনিদের বলে 'কারিগর', অনেক সময় বলে 'মিস্ত্রি', অদ্ভুত, তাই না?"

নজর পড়ল আমগাছের ছায়ায় পাতা দুটো বড় চৌকির উপর। যার অন্তত বিশ ফুটের মধ্যে আর কোনও চৌকি পাতা নেই। সুদৃশ্য বিছানাপাতা দু'টো চৌকির উপর দিবানিদ্রা যাচ্ছেন পুলিশের ইউনিফর্ম-পরা এক মাঝবয়সি, ভুঁড়িওয়ালা হাবিলদার ও অপেক্ষাকৃত কমবয়সি এক কনস্টেবল। তার পাশে একটা পুরনো মোটরসাইকেল স্ট্যান্ড করানো আছে। গাঁ গাঁ করে চলছে তাদের যৌথ নাসিকাগর্জন। হাসি পেল এদের দেখে। সরকার এদের মাইনে দিয়ে রেখেছে, জনগণকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য, আর এরা তাদের অফিস অর্থাৎ থানার কাজকর্ম ছুড়ে ফেলে দিয়ে এইভাবে দিনেদুপুরে ঘুমোচ্ছে। আমগাছটা বেশ বড়। তার ছায়ায় বসলে ভালই লাগত। কিন্তু সে উপায় নেই ওই দুই কুম্ভকর্ণের জন্য। দারোগাবাবু ঘুমোচ্ছেন, তফাতে তো থাকতেই হবে। রামুয়া বলে এক দেহাতি ছোকরা বড় রেকাবি-থালার মধ্যে সাত গ্লাস চা নিয়ে এল। সে হাল্‌কা স্বরে বলল, "বঢ়িয়া নান্‌খাটাই বিস্কুট আছে, লাবো বাবুসাহাব?"

মানুদা বলল, "ঠিক হ্যায়, লাও।" মোষের খাঁটি দুধের চা, তাতে আবার এলাচ-লবঙ্গ গুঁড়ো দেওয়া হয়েছে। অভিনব এই চায়ের স্বাদ। হাতে বানানো নান্‌খাটাই বিস্কুটসহ চা ভালই লাগল।

হঠাৎ "মা-মা-মানুদা—বাঁ-বাঁ-বাঁ—দ-দ-দর—" বাঘার ফাটা রেকর্ড বাজল। আমরা তার হাতের তর্জনীর নির্দেশ অনুযায়ী তাকিয়ে দেখি, এক বিশাল আকারের বীরহনুমান তরতর করে নামছে আমগাছ থেকে। ঘন পাতার ফাঁকে সেটা যে আগে কোথায় লুকিয়ে ছিল কেউ জানে না। হনুমান যে কী জিনিস তা বোঝা গেল তারপর। গাছ থেকে নেমে এসে সেটা একটু দাঁড়াল 'খাররাটে'-করা অর্থাৎ নাসিকাগর্জনরত হাবিলদারের মাথার কাছে। নাকের শব্দে বোধ হয় একটু বিরক্তও হয় হনুমান। তারপর মুখে কিঁচকিঁচ আওয়াজ করে দারোগার নধর গোঁফজোড়া ধরে মেরে দেয় একটান। দারোগাবাবু কাটা ছাগলের মতো লাফিয়ে উঠে, ঘুমভাঙা-চোখে ওই মূর্তিমানকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "বাপ রে, একদম মারডালা।" হ্যান্ডস-আপের ভঙ্গিতে মাথায় তুলে দিয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে "রাম-রাম-রাম-রাম...।"

আমরা বেশ এন্‌জয় করতে লাগলাম ব্যাপারটা। কিন্তু এর মধ্যে যে আসন্ন বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমরা বুঝিনি তখন। আমরা হাসছি। বসে থাকা দেহাতি লোকগুলোও হাসছে, দুই বীর-পুঙ্গবের দুরবস্থা দেখে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ দারোগাবাবু হনুমানের দাঁতখিচুনি দেখে ভয়ে খাটিয়া থেকে উলটে পড়ে গেলেন মাটিতে। তারপর কুমড়োগড়ান গড়াতে শুরু করলেন। এর কোনও এক ফাঁকে তাঁর সার্ভিস রিভলভারটি কোমরের খাপ থেকে খুলে গিয়ে বিছানার উপর পড়ে গেছে। বোধ হয় চেন দিয়ে বাঁধা ছিল না। আমরা বেশ মজা দেখছি তখন। বাঘা, নেরু, নন্তু, পিতু সবাই হো-হো করে হাসতে শুরু করেছে। তিনি গড়িয়ে পড়ে, সেই থেকে 'রাম রাম' করে চলেছেন। সঙ্গে দোহার দিচ্ছেন কনস্টেবলবাবু। বোধ হয় রামকে ডাকছেন, যাতে তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর অনুচরকে নিরস্ত করেন। হঠাৎ দেখি হনুমানটা বিছানার উপর পড়ে থাকা চকচকে রিভলভারটির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। সে একটু এগিয়ে রিভলভারটি দু'হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। সবাই নির্বাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম। আমি সভয়ে মানুদাকে বললাম, "যদি গুলি বেরিয়ে যায়?"

মানুদা অভয় দিয়ে বলল, "সে চান্স কম। সেফ্‌টি-ক্যাচ থাকে রিভলভারের পিছনে। সে ক্যাচ না তুললে গুলি বেরোবে না। অত বুদ্ধি হনুমানের নেই।"

হনুমানটি রিভলভার পেয়ে বেজায় খুশি হয়েছে বলে মনে হল। 'ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচচ' শব্দ করে দাঁত বের করে বোধ হয় হেসেও ফেলল খানিকটা। তারপর তিনি লাফে আমগাছের মাঝারি এক ডালে উঠে বসে উলটেপালটে দেখতে লাগল জিনিসটা। চারদিকে চেয়ে দেখি, দেহাতি লরিচালক ও খালাসিরা সবাই চৌকির নীচে ঢুকে গেছে। দু'-একজন চৌকি উলটে ঢালের মতো করে মাথা আড়াল করেছে। তারা সবাই নিচু স্বরে 'রাম-রাম' করছে। এর মধ্যে ধাবার মালিক দারোগা ও কনস্টেবলবাবুর



দিকে হাত নেড়ে চাপা স্বরে বলল, "দারোগাসাব, কনস্টিবলসাব, ওঁহা খড়া মাত রহিয়ে। চলে আইয়ে অন্দর। গোলি চল সকতা হ্যায়। হনুমানজিকে পাস আপকা পিস্তল হ্যায়।"

এবার বোধ হয় সংবিৎ ফিরল দু'জনের। কোনওমতে হামাগুড়ি দিয়ে দু'জনে ধাবার মধ্যে ঢুকল। হাবিলদারবাবু ওই বিশাল বপু নিয়ে বুকে ছ্যাঁচড়াতে-ছ্যাঁচড়াতে অনেক কষ্টে ভিতরে ঢুকে সিমেন্টের চুল্লির আড়ালে লুকোলেন। বিড়বিড় করে যে কী বলছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। আমি ও পিতু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। তাকিয়ে দেখি, মানুদা কোথায় যেন গেছে। অন্য দিকে তাকিয়ে দেখি, মানুদা গাড়ির দিকে যাচ্ছে। গাড়ির কাছে পৌঁছে, চাবি দিয়ে দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল। বেরিয়ে এল একটু পরে, হাতে একছড়া কলা, যা আমাদের খাওয়ার জন্য রাখা ছিল।

এর মধ্যে ঘটে গেল অঘটন। ধড়াম করে এক কানফাটা শব্দ হল, গুলির শব্দ। আগুনের ফুলকিসহ সেই গুলি ছুটে এল আমগাছের ডাল থেকে। গুলিটা লাগল ধাবার টালির উপর। ঠকাস করে শব্দ হল। তারপর আবার একটা শব্দ, ঠাঁই। তারপর "আঁইরে মাঈ-গোঁ-গোঁ-গোঁ...।" এ শব্দ দারোগাবাবুর গলার। অনুমান করলাম টালিটি খসে তাঁর মাথায় অথবা গায়ে পড়েছে। তার সঙ্গে আর-একটি শব্দ ঠকাস। এ শব্দ রিভলভার মাটিতে পড়ার। হনুমান ভয়ে 'ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-কিঁচ-কিঁচ-কিঁচ' চিৎকার করে মগডালে উঠে পড়ল। মনে হয় এটা ওটা নাড়াচাড়ার সময় সেফ্‌টিক্যাচ খুলে গিয়ে থাকবে। কোনওভাবে হনুমানটি ট্রিগার টেনে দিয়ে থাকবে। যার ফলে এই বিপত্তি। গুলি চলার পর সে ভয় পেয়ে রিভলভার ফেলে দিয়েছে, আর ভয়ে মগডালে উঠে গেছে। গুলি চলার পর মানুদা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমি ও পিতু দু'জনে চৌকির আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। মানুদা হঠাৎ পিতুর দিকে কলার ছড়াটা ছুড়ে দিয়ে বলল, "ধর এগুলো। আর সময় নষ্ট করা নয়। রিভলভারটা পড়ে আছে, চল, কুড়িয়ে নিই।"

এই বলে মানুদা আমগাছের নীচে পড়ে থাকা রিভলভারটার দিকে ছুটল। কিন্তু অদ্ভুত বিচ্ছু হনুমানটা। মানুদাকে রিভলভারটার দিকে এগোতে দেখেই, 'ক্যাঁচক্যাঁচ-কিচকিচ' আওয়াজ করে অবিশ্বাস্য গতিতে আমগাছ থেকে নেমে এসে মানুদার আগেই রিভলভারটার কাছে এসে 'খ্যাঁক-খ্যাঁক' করে দাঁত খিঁচোতে লাগল। মানুদা রিভলভার থেকে হাততিনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে মুখভঙ্গি করছে হনুমানটি। গোটা জায়গাটায় হনুমানের আস্ফালন ছাড়া শ্মশানের নৈঃশব্দ্য। আমি ও পিতু নির্জীবের মতো দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের হৃৎপিণ্ড জয়ঢাকের মতো শব্দ করছে। হঠাৎ মানুদার ফিসফিসে গলার শব্দ কানে এল, "পিতু, কলাগুলো ওর দিকে ছুড়ে দে, এক্ষুনি।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে পিতু কলার ছড়াটা ছুড়ে দিল হনুমানটার সামনে। সে একবার কলার ছড়ার দিকে, একবার রিভলভারটার দিকে তাকাতে লাগল। বোধ হয় বিচার করতে লাগল কোনটা নেওয়া ঠিক হবে। শেষে অনেক বিচার করে কলার ছড়াটা তুলে নিয়ে লাফ দিয়ে আমগাছের মগডালে উঠে গেল। মানুদা হাত বাড়িয়ে রিভলভারটা তুলে নিল। এতক্ষণ সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। মানুদা রিভলভার হাতে নিতেই সবাই যে-যার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে 'ধন্য ধন্য' রব তুলল 'বাবুজি' অর্থাৎ মানুদার নামে।

দারোগাবাবু অজ্ঞান। মাথায় টালি পড়েছে। কয়েক বালতি জল ঢালতেই জ্ঞান ফিরল তাঁর। সৌভাগ্যের বিষয়, ওই নিরেট মাথা টালির ঘায়েও ফাটেনি, শুধু আলুর মতো ফুলে গেছে। কিন্তু মানুদার কথায় বুঝলাম, এখনও সব শেষ হয়নি। সে বলল, "দাঁড়া দেখি, এবার হনুমান ব্যাটা কী করছে? আমরা নিচ থেকে দেখলাম, সে মগডালে বসে কলাগুলো খুশি মনে খাচ্ছে। পেট ঠান্ডা হওয়ার জন্য আনন্দে গা চুলকোচ্ছে।

মিনিটদশেক কাটল। এর মধ্যে ধাবার মালিক আমাদের জন্য আর-এক রাউন্ড চা ও ডবল ডিমের অমলেট নিয়ে এল। এসব নাকি হাবিলদার গজানন চৌবে আমাদের খাওয়াচ্ছেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। কনস্টেবল অর্জুন সিংহের সঙ্গেও আলাপ হল। ভালমানুষ দু'জনেই, একমাত্র দুর্বলতা হচ্ছে ঘুম, দু'জনেরই। মিনিটপনেরো কাটল। মানুদা বলল,"চল, বাইরে গিয়ে হনুমানটাকে দেখে আসি।"

দেখা গেল হনুমানটার চোখ বারবার বুজে আসছে। বিরক্ত হয়ে সে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তারপর পড়তে-পড়তে কোনওমতে পাশের এক ডাল ধরে সামলাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "অমন করছে কেন?"

মানুদা হেসে বলল, "কথা বলিস না, শুধু মজা দেখে যা।"

চেয়ে দেখি হনুমানবাবাজি হাতে-পায়ে দুটো ডাল ধরে এধার-ওধার মাথা ঝাঁকাচ্ছে। মাঝে-মাঝে তার চোখ বুজে আসছে। একটু পরে দেখি দু'হাতে দুটো ডাল ধরে চোখ বুজে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে হাত-পায়ের বাঁধন শিথিল হয়ে হনুমানবাবু মগডাল থেকে পড়তে শুরু করল। হাত-পা দিয়ে ডাল ধরার বিফল চেষ্টা করে সে পড়ল ধপাস করে মাটির উপর। কয়েকবার পালটি খেল। তারপর কোনওমতে উঠে ঘুম-ঘুম চোখে চারদিকে চেয়ে দেখে লেজ তুলে ছুটে পালাল কোনদিকে কে জানে? আমরা সবাই তখন হাসছি।

মানুদা বলল, "ব্যাটা আর এ-তল্লাটে জীবনে কখনও আসবে না। যা দাওয়াই দেওয়া হয়েছে।"

আমাদের আবার যাত্রা শুরু হল। নন্তু, সঙ্গে আমরাও জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কী এমন মন্ত্র পড়লে যে, ওই গুন্ডা হনুমানটা ঘুমিয়ে গেল?"

মানুদা মুখের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল, "বেজায়গায় গিয়ে আমার ভাল ঘুম হয় না। তাই একপাতা ঘুমের ওষুধ সঙ্গে ছিল, দরকার পড়তে পারে ভেবে। তার থেকে চারটে ট্যাবলেট খোসা ছিঁড়ে কলাগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।"

বরদা ভবন

'মোরাম' মানে লাল কাঁকুরে রাস্তা। বেশ সংকীর্ণ। মাঝে-মাঝে গোরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি, ঠেলারিকশাকে জায়গা দিতে হচ্ছে। বেলা চারটে বাজল। পিছনের সিটে নেরু, নন্তু ও বাঘা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার দু'পাশে শাল, বাবলা, সোনাঝুরি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছের মেলা। রংবেরঙের পাখি কিচিরমিচির করছে। দু'পাশে গমের খেত। সামনে কুরচা গ্রাম। তারপরেই

কালিকাপুর। কুরচায় ঢুকতেই একদল ছেলে মহানন্দে আমাদের গাড়ির পিছনে ছুটতে লাগল হইহই করতে-করতে। রুক্ষ লাল মাটির পাথুরে এলাকা। একটু যাওয়ার পর দেখি হাট বসেছে। সাঁওতাল পুরুষ-মেয়ে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে হাটের দিকে যাচ্ছে। দেহাতি বউ কানে রুপোর মাকড়ি, গলায় মোটা রুপোর হার নিয়ে বড় চটের থলিসহ হাটের দিকে যাচ্ছে, কেউ-কেউ বা ফিরছে সেখান থেকে। বেশিরভাগেরই ঠোঁট লাল, পান খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে পিক ফেলছে এধার-সেধার।

হাটও বেশ। খোলা আকাশের নীচে। ছোলার ছাতু, নানারঙের কাচের চুড়ি, বাঁশি, আলু-পেঁয়াজ, পুরনো নতুন জামাকাপড়, রান্নার বাসন, মাটির হাঁড়ি সব বেচাকেনা চলছে। একটু এগোতেই দেখি বড়-বড় হাঁড়িতে করে সাঁওতালরা হাঁড়িয়া বা দেশি মদ বিক্রি করছে। পাশেই চপ, ঝালবড়া ও ঘুগনির দোকান। খদ্দেরের ভিড় বেশ ভালই এখানে।

আরও কিলোমিটারতিনেক যাওয়ার পর রাস্তাটা একটু চওড়া ও ভাল হল। ডান দিকে আট-দশজন দেহাতি মেয়ে মাথায় জলের হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছে। মানুদা গাড়ি থামিয়ে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইয়ে, কালিকাপুর হ্যায় ক্যা?"

অদ্ভুত মেয়েগুলো। লজ্জায় মুখে কাপড় টেনে, খিকখিক করে হেসে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করতে-করতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল। মানুদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এক্কেবারে প্রিমিটিভ। সভ্যতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া পায়নি। বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলবে না এখানকার মেয়েরা। এটাই তাদের গুরুজনের শিক্ষা। দেখি কোনও পুরুষের দেখা পাই কি না?"

আরও খানিকটা যাওয়ার পর দু'জন লোককে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করতেই একগাল হেসে বলল, "হাঁ এ হি কালিকাপুর বা। আপলোগোন কাঁহা যাইয়েগা?"

মানুদা সূর্যকান্তবাবুর নাম করল। দেহাতি দু'জন পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল, "আরে বলিয়ে না, হামলোগতো রাজাসাহাবকা ইস্টিটমে হি কাম করথ হ্যায়। আপলোগোনকা আনেকা সূচি থা। কালসে আপকা ইন্তেজার হো রহা হ্যায়। রাজাজি হামকো ভেজা হ্যায় দেখনে কে লিয়ে। রাম-রাম মালিক।"

এই বলে দু'জনে হাত তুলে নমস্কার জানাল। মানুদাও তাদের সম্ভাষণ জানাল। তারপর বলল, "ঠিক হ্যায়, আপলোগ গাড়িমে আ যাইয়ে।" তারা বেশ খুশিমনে গাড়িতে ঢুকল। আমরা জায়গা করে দিলাম।

আমাদের গাড়ি মোরাম রাস্তা ছেড়ে সমান করে বসানো চওড়া পাথরের রাস্তায় এল। রাস্তার দু'পাশে সারবন্দি ইউক্যালিপ্টাস আর দেবদারু গাছের পঙক্তি। মাঝে-মাঝে সেগুন ও মেহগনি গাছও রয়েছে। রাস্তার অপর পারে দেখি এক বিশালদেহী দরোয়ান দোনলা বন্দুক নিয়ে টুলের উপর বসে আছে। গেট অন্তত তিরিশ ফুট চওড়া। পাঁচিল ফুটপনেরো উঁচু। আমরা গেটের কাছে আসতেই একজন তড়াক করে গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলতে লাগল। দরোয়ান শশব্যস্ত হয়ে বলল, "কা ভইল বা রামভজন?"

গেট খুলতে-খুলতে রামভজন বলল, "বাবুলোগ আইলে বা। পরনাম কর অবতারোয়া।"

অবতার আমাদের দিকে হাত তুলে নমস্কার করল। আমরাও



তাকে অভিবাদন জানালাম।

গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। এই অজ জায়গায় এই জিনিস দেখব আশাও করিনি কখনও। মোটা তারজালে ঘেরা বিশাল-বিশাল বাগান দু'ধারে। বড়-বড় গোলাপগাছ সেখানে। নানারঙের। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। আমগাছ, কাঁঠালগাছ, নারকেলগাছ, লিচুগাছ, আরও কত গাছ রয়েছে বাগানের মধ্যে। টানা রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য ঝাউগাছ। যেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বিশাল প্রাসাদ 'বরদা ভবন'। তার সামনেটাই অন্তত একশো ফুট চওড়া। গোটা প্রাসাদটাই হলুদ রং করা। মনে হয় নতুনভাবে সংস্কার করা হয়েছে। প্রাসাদের সামনে বিশাল লন। সেখানে পাতাবাহার গাছের মেলা। কোনওটা হরতনের মতো, কোনওটা চিড়িতনের মতো, রুইতনের মতো আবার অনেক, ছাতার মতো করে ছাঁটা। বসার জন্য বাঁধানো চেয়ার-টেবিলও আছে সেখানে। প্রাসাদের সামনেই গাড়িবারান্দা। একটা ধাপ, তারপর বিরাট মেহগনি কাঠের সিংহদরজা। অন্তত বারো ফুট লম্বা হবে। চওড়ায় আট-ন'ফুট তো হবেই। কী অপূর্ব কারুকাজ দরজা-জানলার কাঠে! আজকাল এসব কোথাও চোখেই পড়ে না।

গাড়িবারান্দার নীচে আমাদের গাড়ি থামতেই দেখা মিলল সূর্যকান্তবাবুর। অভিজাত চেহারা। চোখে সোনার ফ্রেমের পাতলা চশমা। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কারভাবে কামানো। পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চির মতো উচ্চতা। পরনে হাল্কা নকশাকরা সিল্কের পাঞ্জাবি ও পাতলা শান্তিপুরি চওড়াপাড় ধুতি। বছর বাহান্ন-তিপ্পান্ন বয়স হবে। দুধে-আলতা গায়ের রং। মাথার চুল সামান্য পাতলা হয়ে গেছে। মাথার চুল সাদা-কালোয় মেশানো।

আমাদের দিকে এগিয়ে এসে মানুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসো মানু। তোমরা তা হলে সাতজন। ঠিক যেন সপ্তর্ষিমণ্ডল। তোমার বিশাল চিঠিতে সব জেনেছি, এদের সবার পরিচয়ও পেয়েছি। আমিও তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। পাওনি বোধ হয়?"

আমরা সবাই একে-একে তাঁকে প্রণাম করলাম। মানুদা প্রণাম সেরে বলল, "না কাকাবাবু, আপনার কোনও চিঠি তো পাইনি।"

সূর্যকান্তবাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "না পাওয়ারই কথা। তিনদিন আগে পোস্ট করেছি। তোমার চিঠি পাওয়ার পরই। যাই হোক, এসো, এসো তোমরা।"

তাঁর কথায় কেমন যেন এক রহস্যের গন্ধ পেলাম আমি। মনে হল, ঠিক এই সময়ে যেন তিনি আমাদের আসাটা কোনও একটা কারণে মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারেননি সম্পূর্ণভাবে। এ আমার ভুলও হতে পারে।

দরজা পেরিয়ে বিরাট হলঘর। লাল পেটাই-করা মেঝে। এত দিনের পুরনো, অথচ চকচক করছে নতুনের মতো। প্রায় বিশ ফুট উঁচু দেওয়ালে অসংখ্য অয়েল পেন্টিং। ঘরের মাঝখানের ছাদে বিরাট একটা ঝাড়বাতি ঝুলছে। আগে বোধ হয় মোমবাতি লাগানো হত। এখন দেখলাম অনেক টুনিবাল্‌ব লাগানো আছে। আলোর প্রতিফলন এত ভাল যে, গোটা হলঘরটা আলোয় ঝলমল করছে। বাঁ পাশের দেওয়ালে অনেক বাইসনের শিংসহ মাথা, বাঘের মাথা, হরিণের মাথা স্টাফ্‌ করে টাঙানো আছে। ঘরের এক কোণে কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে একটা বড় ভালুকের দেহ, কয়েকটা চামড়াসুদ্ধ বাঘের দেহ ও গোটাদু'য়েক সিংহের মাথা দেখতে পেলাম। এসব সূর্যকান্তবাবুর পূর্বপুরুষদের শিকারের নেশার ঐতিহাসিক সাক্ষী। ভাবতে লাগলাম, এঁদের শিকার করা ছিল নেশার মতো। অকারণে খেলার ছলে তাঁরা বনের প্রাণীদের হত্যা করে আনন্দ পেতেন, নিজেদের 'বীর' বলে প্রতিপন্ন করতেন। আর এখন বন্যপ্রাণীর সংখ্যা এত কমে গেছে যে, অভয়ারণ্য করে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে।

হেমদাকান্ত, করুণাকান্ত, যমুনাকান্ত, বরদাকান্ত, বগলাকান্ত, অমলাকান্ত, সবাই তাঁর পূর্বপুরুষ। অমলাকান্ত ও সুচিশীলাদেবী তাঁর বাবা ও মা। বগলাকান্ত তাঁর পিতামহ। বরদাকান্ত প্রপিতামহ। বরদাকান্ত এই পরিবারের সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তি। তিনি এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বিদেশেও গিয়েছিলেন। এঁদের সকলেরই অয়েলপেন্টিং রয়েছে।

এবার সূর্যকান্তবাবু আমাদের উপরে যেতে বললেন। সঙ্গে চলল রামভজন, তাঁর খাস ভৃত্য। বিশাল হলঘরটা পেরিয়ে চললাম আমরা, সঙ্গে পথনির্দেশক রামভজন। তারপর প্রকাণ্ড এক করিডোরের শেষে দু' সারি সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। নীচেরতলাটা লাল পাথর-পেটাই। আর সিঁড়িগুলো দেখলাম মোটা শ্বেতপাথরের। সিঁড়ি ওঠার দেওয়ালে দেখলাম বিদেশি শিল্পীর আঁকা দুটো অপূর্ব কলাকৃতি। দোতলার গোটাটাই মোটা রাজস্থানি শ্বেতপাথরে মোড়া মেঝে। কোথাও একফোঁটা দাগ বা ময়লা নেই। দেওয়াল সাদা অয়েলপেন্ট করা। ঝকঝক করছে। একটু এগোতেই একপাশে এক অপূর্ব সিমেন্টের ভাস্কর্য, মায়ের কোলে শিশু।

আমাদের যে ঘরটায় আনা হল সেটা বিরাট আকারের। ঘরে ঢোকার পর দেখি গোটা ঘরটা কাশ্মিরি কার্পেটে ঢাকা। বড়-বড় সোফাসেট। কালো মেহগনি কাঠের নিচু টেবিল তার সামনে। ওপাশে বড় কালার টেলিভিশন, একটা জমকালো টিভিস্ট্যান্ডের উপর। কোণে তিনশো লিটারের দুধসাদা রেফ্রিজারেটর। দুটো বড় খাট আছে ঘরের অন্য দিকে। দুবেজির বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে। চোখে ভারী চশমা। গায়ে ফতুয়া ও ধুতি। রাজাবাবুর ভীষণ বিশ্বাসী লোক। সব কাজেই তাঁর ডাক পড়ে। আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে বললেন, "আপলোগ যাকে আরাম কিজিয়ে। থোড়া হাথ-মুহ ধো লিজিয়ে বাথরুম যাকে। রাজাবাবু ফির আয়েঙ্গে। হামকো আভি আজ্ঞা দিজিয়ে।"

মানুদা বলল, "ঠিক হ্যায় আইয়ে আপ।"

দুবেজি বেরোতে যাচ্ছেন, এমন সময় সূর্যকান্তবাবু এ-ঘরে এলেন। তাঁকে দেখে দুবেজি দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি আমাদের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা তো আবার সাতজন, সপ্তর্ষিমণ্ডল। এক সঙ্গে শুতে আশা করি পছন্দ করবে। এ-ঘরে দুটো খাট আছে। দুবেজি, আপনি কাউকে ডেকে এ-ঘরে আরও দুটো খাট ঢুকিয়ে দেবেন। মানু একাই শোবে, বাকি সকলে দু'জন-দু'জন করে শোবে।

"যে আজ্ঞা রাজাসাহেব," বলে দুবেজি চলে গেলেন।

রাজাসাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চান করে তৈরি হয়ে নাও তোমরা। খাবার টেবিলে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমার মেয়ে রানিকে তো তুমি দেখেছ মানু, তার



বয়স এখন দশ। ফাইভে পড়ে। ও তোমাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমিই তাকে আটকালাম। তোমরা তেতেপুড়ে এসেছ। একটু পরেই না হয় কথা বলবে।"

মানুদা বলল, "আহা, ওকে আবার আটকালেন কেন?"

তিনি বললেন, "তোমরা যাও, একে-একে চান করে নাও। অনেক বাথরুম আছে। আমি আসি এখন।"

পাঁচটা বড়-বড় বাথরুম দোতলায়। সবক'টি দেখার মতো, আধুনিক সব রকমের সুবিধে আছে। দামি শ্বেতপাথরের তৈরি বাথরুমগুলো। বেশ তাড়াতাড়িই আমরা রেডি হয়ে নিলাম। এখন আমাদের পরনে হলুদ সিল্কের পাঞ্জাবি ও সাদা পাতলুন। এই পরিচ্ছদ আমরা আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলাম। বাটলার রমেশ দেওয়ান ও দুবেজি এলেন আমাদের ডেকে নিয়ে যেতে। আমরা তাঁদের সঙ্গে ডাইনিং হলের দিকে চললাম। রমেশ দেওয়ানের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। কালচে, লোমশ চেহারা। প্যান্ট-শার্ট পরা। পরে জেনেছিলাম যে, আগেকার বাটলার আশুতোষ মাইতি ছিলেন সূর্যকান্তবাবুর বাবার আমলের লোক। সত্তরের উপর বয়স হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর নিবাসস্থল মেদিনীপুর চলে যান। যদিও রাজাবাবু তাঁকে অনেক অনুরোধ করেন এখানে থেকে যেতে। তিনি মাসে-মাসে এস্টেট থেকে পেনশন পাচ্ছেন। রমেশ দেওয়ান মাসআটেক এই বরদা ভবনে বাটলার হিসেবে কাজ করছে। ড্রাইভারি জানে, ইলেকট্রিকের কাজ জানে, টাইপ করতে পারে, খুঁটিনাটি অনেক কিছুই। সে কাজ পেয়েছে রাজাবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রাণগোপাল রক্ষিত মশাইয়ের সুপারিশে।

পাচক তিলক দাশ। গোলগাল ভালমানুষ চেহারা। ভাল রান্না করে তিলক। আধুনিক অনেক পদ তৈরিতে তার জুড়ি নেই। সুশীলাদেবী, বছরতিরিশের বিধবা। সব সময় মাথায় ঘোমটা টানা। রানির দেখাশোনা সে-ই করে। মায়ের মতো ভালবাসে মা-মরা মেয়েটাকে। কাজ করে নিঃশব্দে। ছোটখাটো চেহারা। গায়ের রং স্লেটকালো। মুখের আদল খারাপ নয়।

আমরা ডাইনিং হলে ঢুকলাম। বিরাট বাঙ্কোয়েট হলের মতো বড় খাবারঘর। ডাইনিং টেবিলটা বোধ হয় সেগুন কাঠের তৈরি। মোট এগারোটা সুদৃশ্য চেয়ার দিয়ে সাজানো। আমরা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। সঙ্গে-সঙ্গে দেখি, ঢুকছেন সূর্যকান্তবাবু, সঙ্গে রানি। তার পরনে বাটিকের কাজ করা সিল্কের জামা। ছোট্ট



মেয়ে। কী অপূর্ব দেখতে! ঠিক যেন সৌন্দর্যের দেবী মিনার্ভার এক খুদে সংস্করণ। রানির মা মীরাদেবী তার জন্মের সাত বছর পরে এক দুরারোগ্য অসুখে মারা যান। তারপর সূর্যকান্তবাবু ছেলে রতিকান্ত ও মেয়ে রানিকে একেবারে বাবা-মায়ের স্নেহ দিয়ে মানুষ করছেন। রতিকান্তর বয়স এখন সতেরো বছর। সে সুইজারল্যান্ডে পড়াশোনা করছে। জানুয়ারি মাসে ভারতে আসে।

বিরাট টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারটায় বসলেন রাজাবাবু। তাঁকে আসতে দেখেই আমরা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বসার পরে হাত নেড়ে আমাদের বসতে বললেন। তিনি রানির সঙ্গে আমাদের আলাপ করালেন। আমরা নাম বলতেই সে এক-একবার করে মাথা ঝাঁকাল। রাজাবাবু ডাকলেন তিলককে, বললেন, "তিলক, ওদের খাবার দাও। আমি শুধু এককাপ কফি নেব। রানি বোধ হয় একটু খাবে।"

আমরা দেশি ঘিয়ের পরোটা, পনিরের ডালনা, বোনলেস চিকেন-ফ্রাই খেতে শুরু করলাম। সঙ্গে আছে ঘন ক্ষীরের তৈরি সিমাইয়ের পায়েস ও তালশাঁস সন্দেশ। নেরুটা একটা কেমনধারা! ও প্রায় কিছুই খাচ্ছে না। এই লোকদেখানো ন্যাকামোগুলো ওর খুব আছে। অথচ আমাদের মধ্যে ও-ই খাওয়ার ব্যাপারে সবার চেয়ে এগিয়ে। ভীষণ খেতে পারে। সব সময়ই খাই-খাই করে এমনিতে। চেহারাটাও বেশি খাওয়ার জন্য বেশ ঢোলের মতো।

তিনি সবই লক্ষ করছিলেন। আমরা যে-যার মতো খাচ্ছিলাম। প্রত্যেকেরই খিদে পেয়েছিল এতটা রাস্তা এসে। তা ছাড়া দুপুরে ভাতও খাওয়া হয়নি। একমাত্র নেরু ভাল করে খাচ্ছিল না। কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের মধ্যে নেরু কে?"

নেরু মুখ তুলে বলল, "আমি কাকাবাবু।"

তিনি বললেন, "আরে মানু, তুমি না লিখেছিলে, তোমাদের মধ্যে নেরু একটা আধমনি কৈলাস। বিরাট খাদ্যরসিক। সাংঘাতিক রকমের খেতে পারে। এ কী? এখন তো দেখছি ও-ই সবচেয়ে কম খাচ্ছে। কী ব্যাপার? আমি তো তোমার খাওয়া দেখব আশা করেছিলাম। তুমি তো আমাকে ভীষণ ডিসাপয়েন্ট করলে নেরু।"

নেরু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল, "খাইয়া-খাইয়া মোটা হইয়া যাইতে আছিলাম। অহন তাই ডায়েটিং করতাছি।"

পিতু বলল, "বাজে বকিসনি নেরু। তু খিদা পেলে পাথর খেং ফেলিস। তু করবি ডায়েটিং? পরশু হলধরকাকার ছেলার পৈতাতে বাহাত্তরটা রসগোল্লা সাঁটিং দিলি। ইখানে ল্যাকামি মারছিস ক্যানে?"

পিতুর বীরভূমি ভাষা শুনে রানি খিলখিল করে হেসে উঠল, "নেরুদা, বাঘাদা, পিতুদা তোমরা সবাই মজার, ভীষণ মজার...।"

ছায়ামূর্তি

কিছুক্ষণের মধ্যেই রানির সঙ্গে আমাদের ভীষণ ভাব হয়ে গেল। রানিও মহারানির মতো আমাদের সবকিছু দেখাতে লাগল। এই প্রাসাদের চারপাশে প্রায় দু' একর জায়গা। চারদিক পাঁচিলঘেরা। এর মধ্যে বড় পুকুর আছে। টেনিস কোর্ট আছে। তিনশো একর চাষজমি আছে রাজাবাবুর। তা ছাড়াও যে কত জায়গা আছে তা বলা সম্ভব নয়। বড়-বড় প্লট নিয়ে ফার্মহাউস আছে অনেক। তাতে সারা বছর ধরে চাষ হয়। ফুলের বাগিচা আছে। যেখানে বাসমতী ধানের চাষ হয়। সুগন্ধী বাসমতী চাল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। জমিদারি এখন আর নেই। কিন্তু তাঁর সুচিন্তিত ব্যবসাবুদ্ধি থাকায় তিনি অনেক বেশি রোজগার করেন। কত রোজগার করেন? সে আমাদের চিন্তারও অতীত।

এবার রানি আমাদের লাইব্রেরিতে নিয়ে এল। থরে-থরে বই সাজানো সুদৃশ্য আলমারিগুলোয়। মেঝেয় পুরু কার্পেট। টেবিল-চেয়ার সাজানো। পুরনো থেকে নতুন অনেক পত্রিকার অসংখ্য পুজোসংখ্যা রয়েছে আলমারিতে। এ ছাড়া বিদেশি কোন লেখকের বই নেই? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে একালের সত্যজিৎ রায়, আশাপূর্ণা দেবী, কেউ বাদ যাননি। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞানচর্চার উপর প্রবন্ধের বইও অনেক। রানিরও একটা সেকশন দেখলাম। টিনটিন, অ্যাস্টেরিক্স, ফ্যানটম প্রভৃতি কমিক্স ছাড়াও, ঠাকুরমারঝুলি, আবোল তাবোল, হযবরল প্রভৃতি বইয়ে আলমারি ঠাসা।

আর-একটা ঘরে আছে এক বিশাল বিলিয়ার্ড টেবিল। যা বরদাকান্ত রায় বিদেশ থেকে আনিয়েছিলেন। তার পাশেই মিউজিক রুম। অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র আছে এখানে। রুপোর পাতে মোড়া বিভিন্ন ধরনের বাঁশি, আরও কত কী। ঘরের মাঝখানে দেখলাম এক সুদৃশ্য পিয়ানো। মানুদা এগিয়ে গিয়ে পিয়ানোর ঢাকনাটা খুলে ফেলল। তারপর বসে রিডগুলোর উপর আঙুল দিয়ে টুংটাং মিষ্টি আওয়াজ তুলতে লাগল। আমরা জানি মানুদার অনেক গুণ আছে। তবে সংগীতেও যে সে এতটা পারদর্শী, তা জানা ছিল না। আমাদের অবাক করে দিয়ে সে পিয়ানোয় 'পুরানো সেই দিনের কথা' বাজাতে শুরু করল। আমরা নির্বাক হয়ে শুনলাম। বাজানো শেষ হতেই রানি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "তুমি তো দারুণ বাজাও মানুদা। এত ভাল বাজাতে আমি কাউকে দেখিনি।"

আমি বললাম, "তুমি যে এত ভাল পিয়ানো বাজাও কখনও বলোনি তো? আর-একটা বাজাও।"

মানুদা মৃদ হেসে বলল, "না রে, পরে কখনও বাজাব। কিছুদিন পণ্ডিত ভি বালসারার কাছে শিখেছিলাম। সপ্তাহে একবার গিয়ে শিখতে হত। পড়াশোনার জন্য পিয়ানো শেখা বেশি দূর এগোয়নি।"

দেখতে-দেখতে সন্ধে নেমে গেল। রানি তখন থেকে আমাদের সঙ্গেই আছে। কথায়, গানে, হাসিতে আমাদের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে যাচ্ছে। বড়ই প্রাণচঞ্চল মেয়ে। আমরা যে ঘরে আছি, সেখানকার রঙিন টিভির সঙ্গে ভিসিডি জুড়ে দিল সে। এখানে কোনও কেব্‌ল লাইন নেই টেলিভিশনের। তাই রাজাবাবু অনেক সিডি রেখেছেন দেখার জন্য। তাঁর সময় হয় না। সব রানিই দেখে। সে এখন আমাদের জন্য 'ইনডিপেন্ডেন্স ডে' চালাল। এলিয়েনদের অগ্নিময় ধ্বংসলীলা। আর দু'জন বৈজ্ঞানিকের জীবনপণ সংগ্রাম।

আমরা সবাই মশগুল হয়ে সিনেমা দেখছিলাম, হঠাৎ বাঘার ফাটা রেকর্ড বেজে উঠল, "আরে-নে-নে-নেরুকে দে-দে দেখছি

না তো! ও কো-কো-কো..."

তার কথা শেষ না হতেই মানুদা বলল, "কী আশ্চর্য? সত্যিই তো নেরু নেই। কোথায় গেল?"

লোডশেডিং চলছে। রাজবাড়িতে জেনারেটার চলছে। তাতে সব আলো জ্বলে না। বাইরে বেশ আলো-আঁধারি। তার উপর রানিও বলল, "জায়গাটা রাত্রে ভাল না। কয়েকদিন আগে নাকি ডাকাত এসেছিল। অবতারকাকা বন্দুক চালিয়েছিল। তার বাবাও পিস্তল নিয়ে গেট অবধি গিয়েছিলেন। রাত্রে নাকি লালু-ভুলু ও ছক্কা-পাঞ্জাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা হচ্ছে চারটে বিশাল কুকুর।"

পিতু বলল, "চলো ক্যানে বাইরে। এট্টু দেখে আসি নেরু গেল কতি? বায়স্কোপটো লয় পরেই দেখা যাবে।"

মানুদা রাজি হল তার কথায়। রানি রিমোট টিপে টিভি আর ভিসিডি বন্ধ করে দিল। বলল, "চলো, সবাই মিলে দেখে আসি সে কোথায় গেল।"

আমরা ঠিক করলাম এই সামান্য ব্যাপারে কাউকে আর জিজ্ঞেস করব না। আমরা দালানের মধ্যে যতটা পারা যায় খুঁজলাম তাকে। দেখতে পেলাম না কোথাও। প্রাসাদের পিছন দিকটা তখনও আমাদের দেখা হয়নি। সেখান দিয়ে কিছুটা এগোতেই কানে এল কুকুরের সুতীক্ষ্ণ চিৎকার। এদিকটা অনেকটা পার্কের মতো। চারদিকে বাগান। তারজালে ঘেরা। মাঝখানে দেখলাম ফোয়ারার চৌবাচ্চা আছে। এখন অবশ্য ফোয়ারা বন্ধ। মাঝে-মাঝে বসার জন্য সিমেন্টের তৈরি চেয়ার-বেঞ্চ আছে। এ ছাড়া স্লিপিং-স্লোপ, ছোট মেরি-গো-রাউন্ড, কৃত্রিম গুহা, দোলনা রয়েছে। বুঝলাম, এসব রানির খেলার জন্য। বাগানটার অন্য দিকে সারি-সারি শাল, মেহগনি, সেগুন, অর্জুন প্রভৃতি দামি-দামি গাছ রয়েছে। এদিকটায় এমনিতে হ্যালোজেন আলো জ্বলে। তবে এখন পাওয়ার না থাকায় দুটো বাল্‌ব জ্বলছে। বেশ আলো-আঁধারি। বাগানের আর একদিক লোহার নেট দিয়ে ঘেরা, কুকুর রাখার জায়গা। কুকুরের ঘরও আছে বেশ বড়। তাতে আলো ও বৈদ্যুতিক পাখাও আছে। দুটো হাউন্ড, নাম 'পাঞ্জা' ও 'ছক্কা'। আর দুটো ডোবারম্যান, নাম 'লালু' ও 'ভুলু'। কুকুর চারটে উন্মত্তের মতো চিৎকার করছে। একটা ডোবারম্যান আবার বন্ধ লোহার নেটের দরজায় খামচাচ্ছে। বুঝলাম, এরা কিছু একটা দেখেছে যা তাদের ভাল ঠেকছে না।

আমরা কুকুরঘরের দিকে যেতেই তারা রানিকে দেখে সুর পালটাল। এখন তাদের গলায় আকুতিভরা 'কুই-কুই' শব্দ বেরোচ্ছে। তারা অসম্ভব ছটফট করছে। যেন রানিকে অনুরোধ করছে তাদের ছেড়ে দিতে। আমাদের এবার দৃষ্টি গেল দূরে একটা সেগুনগাছের দিকে। সেখানে একটা ছায়ামূর্তি যেন গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো ওঠানামা করছে। এর চেয়ে ভাল করে বোঝা গেল না। আমি বললাম, "মানুদা, কী করব? ওটা নেরুও হতে পারে। কিন্তু নেরু যা ভিতু, ও ওই আলো-আঁধারির মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকবে? কে জানে?"

নন্তু বলল, "তা হলে এক কাজ করি, অবতারকাকাকে ডেকে আনি। জানি না, রানি বলছে এখানে বদলোকের আনাগোনা হয়।"

মানুদা বলল, "ঠিক বলেছিস। আগে ওই ছায়ামূর্তির রহস্য বের করি। তারপর না হয় দেখা যাবে নেরু কোথায় গেল। চল, অবতারকাকাকে ডেকে আনি।"

পিতুকে নিয়ে আমরা মাঝে-মাঝে বিপদে পড়ি। এখনও পড়লাম। পিতু এগিয়ে এসে বলল, "ইটো কী হচ্ছে। একটো ছায়ামূর্তি দিখা যেছে, তার জন্যি দরোয়ানকাকাকে ডাকতি হবে। ইতো জানের মায়া? সবাই থাক এই ঠান। আমি দেখি আসি। কেহরে যেতি হবে না আমার সহিত। উ ছায়ামূর্তি যেই হোক, উলটো দিকে মুখ করি দাঁড়িন আছে। তোরা চুপচাপ থাক। অরে বুঝতি দিস না। আমি হেই যাব আর হেই ধরব।"

মানুদাও কিছু বলছে না। কারণ, সে জানে পিতু কী ধরনের গোঁয়ার, এ সময় সে কারও কথাই শুনবে না। আর ওকে আটকানোও সম্ভব নয়, ওর গায়ে যা জোর। বোধ হয় ওই দরোয়ান অবতার সিংহকেও দু'মিনিটে পিতু পেড়ে ফেলবে ক্যারাটের মারে। পিতু এগোল গুড়ি মেরে চার হাতে-পায়ে ভর দিয়ে। শিকারি চিতার মতো। তার কালো অ্যাথলেটিক, পেশিবহুল শরীরটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে সারি-দেওয়া গাছের দিকে এগিয়ে চলল। নন্তুও তার দিকে যাওয়ার জন্য এগোচ্ছিল, মানুদা তাকে বারণ করল। ছায়ামূর্তিটা আসলে সত্যিই কোনও মানুষ, না গাছের ছায়া, তা ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো কিছুই না, গাছের ডালপালার ছায়া পড়ে মনে হচ্ছে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে গাছে ভর দিয়ে, আর তার বাঁ হাতে একটা কিছু আছে। ডান হাতটা ওঠা-নামা করছে। যদি বদ মতলবে কেউ এসে থাকবে, তবে ওভাবে নির্লিপ্ত হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়েই বা থাকবে কেন? সবকিছু ভাবছি যুক্তি দিয়ে, তবু একটা কৌতূহল আমাদের চিবিয়ে খাচ্ছে। দেখা যাক কী হয়?

ছায়ামূর্তির ফুটপাঁচেকের মধ্যে এসে গেছে পিতু। আমরা টানটান উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পিতু লাফিয়ে উঠল। তার মুখ থেকে বের হল রক্ত হিমকরা 'হু-ই-ই-ই' আওয়াজ। পরে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছায়ামূর্তির উপর। পিতুর শরীরের ধাক্কায় কে একজন মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল। তারপর গড়াতে-গড়াতে চলে গেল বেশ কিছুটা। পিতু একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত জড়ো করে স্টান্স নিল। এবার পিতু আঘাত করতে চলেছে। আমরা রক্তজমা উত্তেজনায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় পিতুর বীরভূমি ভাষার মোলায়েম কণ্ঠস্বর কানে এল, "তোরা চলি আয়। ইটো সেমসাইড হই গেছে বটে। ইটো নেরুই ছিল।"

আমরা হাঁ হাঁ করে ছুটে গেলাম সেদিকে। গিয়ে দেখি নেরু ঘসের উপর পড়ে আছে, ঘাড়ে হাত দিয়ে। মুখে যন্ত্রণার শব্দ। তার সামনে বিরাট এক শালপাতার ঠোঙা পড়ে আছে। অনেক জিলিপি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে। পিতু হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুদা সস্নেহে তাকে তোলার চেষ্টা করল। নেরু বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল। কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, "আঃ আঃ, আমার ঘাড়খানা বোধ হয় ভাইঙ্গা দিসে ওই বনমানুষে।"

মানুদা হাসি চেপে বলল, "এত জিলিপি এল কোথা থেকে? তুই তো সিনেমা দেখছিলি, এদিকে এলিই বা কখন? আর তোর তো আবার ভূতের ভয়! এই ফাঁকা জায়গায় তুই একা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জিলিপি খাচ্ছিস, এ-কথা কার মাথায় আসতে পারে বল? পিতুকে অযথা দোষ দিয়ে লাভ নেই।"

"ও-হো-হো-আমার ঘাড়টা।" এই বলে ককিয়ে উঠে নেরু বলল, "তোরা যখন সিনেমা দেখতে আছিলি, তহন একফাঁকে আমি উইঠ্‌ঠা বাইরে চইলা যাই। তরা এত মশগুল আছিলি যে,



বুঝতে পারিস্‌ নাই। আমি চইল্লা যাই তিলকের কাছে রান্নাঘরে। বড়ই ক্ষুধা পাইয়া গেসিল। ইন্ডিপেন্ডেন্স-ডে আমি আগে সাতবার দেখসি। তিলকরে কইলাম, কিসু খামু। সে বড়ই কৃতার্থ হইল শুইন্যা। রাতের জন্য ছানার জিলাপির সরঞ্জাম রেডি আছিল। সব কাজ রাইখ্যা আমার জন্য অনেক জিলাপি বানাইয়া দিল। তরা সব সিনেমা দেখতাছস, তাই কাউকে ডিসটার্ব না কইরা বাগানে আইস্যা জিলাপি খাইতে ছিলাম মনের সুখে। অত কুকুর কী সুন্দর চিৎকার করতে আছিল, তাই ভয়ও ছিল না। এর মধ্যে এতসব হইয়া যাইব কেডা জানত? আর পিতু, আমি তর সঙ্গে আর কখনও বাইরে যামু না, এই শ্যাষ। তর মতো অসুর লইয়া চলাফেরা করনও অন্যায়। কখন বেঘোরে মারা পড়ুম কেডা জানে?"

আমরা অতি কষ্টে এতক্ষণ হাসি চেপে রেখেছিলাম। রানি খিলখিল করে তার মুক্তার মতো দাঁত বের করে হেসে বলল, "নেরুদা, তুমি একটা জিনিয়াস। তখন খাবার টেবিলে কিচ্ছু খেলে না ন্যাকামো করে। যখন এতই খিদে পেয়েছিল তখন খাবার সময় অমন ভাব করছিলে কেন? তুমি নাকি ডায়েটিং করছ, তাই ভীষণ কম খাও। মিথ্যে কথা বললে তার ফল ভোগ করতে হয়। কেমন মজা?"

আমরা আর পারলাম না। সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। পাশে তাকিয়ে দেখি তিলক আবার অনেক জিলিপি নিয়ে হাজির। আমরা সবাই তাতে হাত বাড়ালাম। নেরু অপ্রস্তুত অবস্থায় ঘাড়ে হাত দিয়ে আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে

আমরা পরদিন ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিলাম। তিলক চা ও বিস্কুট দিয়ে গেল। দুবেজি এসে আমাদের ডাকলেন ঠাকুরঘরে যাওয়ার জন্য। আমরা তাঁর সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, রাজাবাবু স্নান সেরে গরদের কাপড় পরে, কপালে চন্দনের তিলক নিয়ে পূজায় বসেছেন। রানিও একপাশে হাত জোড় করে বসে আছে। সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে। আমরাও চট করে সেখানে বসে গেলাম। সারাঘরে একটা পবিত্রতা বিরাজ করছে। এক কুশাসনে তিনি বসে আছেন। বিড়বিড় করে চোখ বুজে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। তাঁর সামনে অন্তত চার ফুট উঁচু কালো কষ্টিপাথরের লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ। তার দু'পাশে সোনার পিলসুজের উপর দুটি সোনার প্রদীপ জ্বলছে।

পুজো শেষ হল। আমরা বৈঠকখানায় এলাম। রাতেই আমাদের প্ল্যান হয়ে গিয়েছিল জায়গাটা ভাল করে ঘোরার ও একটা ছোটখাটো পিকনিকের মতো করার। অবশ্যই রানিকে সঙ্গে নিয়ে। মানুদা তাঁকে অনুরোধ করে গোটা ব্যাপারটা বলল।

তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা তো এসেছ ঘোরার জন্যই। তবে সঙ্গে কুলদীপ অর্থাৎ আমার ড্রাইভারকে নিয়ে যাও। ও শক্ত লোক, সঙ্গে থাকুক।"

পিতু বলে উঠল, "না কাকা, আমরা হেই সাতজনই যাব। আর রানি আমাদের বহিন আছে। উ তো থাকছে। উ সব দেখিং দিবে।"

তিনি পিতুর কথায় মৃদু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, তারপর তোমার মতো এক ব্রুস লি সঙ্গে আছে, দেহরক্ষী হিসেবে। ঠিক আছে, যাও তোমরা। তিলককে বলে দেবেন, দুবেজিও যেন ওদের দুপুরের খাবার হটপটে প্যাক করে ওদের গাড়িতে তুলে দেয়।"

দুবেজি "যে আজ্ঞে," বলে চলে গেলেন।

মানুদা বলল, "আপনাদের সেই দিঘির মাঝে কালীমন্দির দেখার ইচ্ছা আমাদের সকলেরই। ওখানকার বাগানেই তো ভাল পিকনিক হতে পারে।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, দেখার জায়গা আরও আছে। ওই কালীমন্দির আমাদের পূর্বপুরুষের। আমি ভেবেছিলাম আমিই সময় করে তোমাদের দেখাতে নিয়ে যাব। তা ঠিক আছে, রানিমা তোমাদের সব দেখিয়ে দিতে পারবে। একটা কথা। বিকেল পাঁচটার বেশি দেরি কোরো না। তার মধ্যে ফিরে আসবে।"

মানুদা বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তার আগেই ফিরব।"

তিনি বললেন, "তা হলে সকালের খাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ো তোমরা। তিলককে একটু সময়ও দেওয়া দরকার খাবার তৈরির জন্য। আমি এখন বেরোব, তোমরা ভালভাবে এন্‌জয় করো। আমাকে একবার সিউড়ি যেতে হবে।"

ভীষণ জলের অভাব ছিল এই অঞ্চলে। একটা লোকাল পঞ্চায়েত আছে বটে, কিন্তু কোনও কাজই হয় না। তাই রাজাবাবু অর্থাৎ আমাদের সূর্যকান্তবাবু নিজের খরচে অনেক ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া উপর মহলে বারবার লেখালিখি করে একটা ক্যানেল কাটিয়েছেন। তাতে জল আসে ময়ূরাক্ষী নদী থেকে। এতে গ্রামবাসী অনেক উপকৃত হয়েছে। আগে জায়গাটা অনেক শান্তির ছিল। এখন কিছু বদ লোকের আমদানি হয়েছে। যার ফলে রাতের পরিবেশ আর মোটেও ভাল নয়। এখানে কোনও স্কুল ছিল না। রাজাবাবু ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে চেষ্টা করে এখানে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এ অঞ্চলে ধূমপানের ধরনটা অদ্ভুত। সিগারেট তো চলেই না। চলে সাঁওতালদের তৈরি বিশাল লম্বা বিড়ি, যাকে 'চুটিয়া' বলে। এক-একটা পাঁচ-ছ' ইঞ্চি লম্বা। শালপাতায় মোড়া দিশি তামাক। কিছু দূর এগোতেই দেখলাম অনেক লোকের ভিড়। সেখানে পলিথিন ও তেরপলের তাঁবু। তার উপরে পোস্টার টাঙানো। এটা ভিডিওহল। সিনেমা চলছে অমিতাভ বচ্চনের 'গঙ্গা কি কসম'। পুরনো ছবি। আর-একটু এগোতেই দুটি মন্দির। একটা রাম মন্দির, আর-একটা হনুমানজির। দু'পাশের দেওয়ালের চটা উঠে গেছে। অনেক বুড়ো মানুষ বসে আছে। চাতালে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

রানির নির্দেশমতো আমাদের গাড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে চলল। রাস্তার দু'পাশে শাল-বাবলার সারি। অনেক পাখি কিচিরমিচির করছে। দু'পাশে গমের খেত। সামনে ক্যানেলের জল বয়ে চলেছে। ক্যানেলের উপর পারাপারের জন্য ছোট্ট কাঠের সাঁকো। আমি মানুদার পাশেই বসেছিলাম। সে হেডলাইট জ্বালল। এটা ড্রাইভারদের একটা সিগনাল। অর্থাৎ 'আমি আগে এই সাঁকো পার হব।' আর সেটাই হচ্ছে নিয়ম। সাঁকোর যা অবস্থা তাতে



একটা গাড়িই কোনওমতে পার হতে পারে। মানুদা মাঝামাঝি যেতেই ওপাশ থেকে একটা বিশাল গাড়ি সাঁকোর মধ্যে উঠে এল। সেটা একটা বিশাল ওয়াগন-ভ্যান। মানুদা ব্রেক কষল। দুটো গাড়ির মধ্যে ব্যবধান তখন ইঞ্চিআটেকের। আমাদের গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে। মানুদা গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, "এ কী অভদ্রতা? সিগনাল দিয়ে পার হচ্ছি, আর আপনারা এভাবে গাড়ি তুলে দিলেন? গাড়ি ব্যাক করুন।"

ওয়াগন-ভ্যানের চালক একজন দাড়িওয়ালা, বিশালদেহী। মাথায় সবুজ ক্রিকেট-ক্যাপ। মধ্যবয়স্ক। তার পাশে একটা ষন্ডামার্কা লোক বসে। দাড়িওয়ালা, মুখের চুরুট থু-থু করে ফেলে দিয়ে বাজখাঁই গলায় ইংরেজিতে বলল, "গেটআউট অফ মাই ওয়ে ইমিডিয়েটলি।"

মানুদা এত ঠান্ডা মাথার ছেলে, তারও মেজাজ চড়ে গেল। সে গলা চড়িয়ে বলল, "হোয়াট দ্য হেল ইউ আর টকিং অ্যাবাউট? জাস্ট গেট ব্যাক্ অ্যান্ড মেক মাই ওয়ে। কাম অন।" দাড়িওয়ালা এক বিচিত্র ধরনের হাসি হাসল। তারপর আর-একটা চুরুট লাইটার দিয়ে ধরাতে-ধরাতে পাশের লোকটাকে একটা ইঙ্গিত করতেই সে নেমে এল গাড়ি থেকে। পিছন থেকে নামল আরও ছ'জন। প্রত্যেকে কেমন গুন্ডা-গুন্ডা দেখতে।

পিতুকে আটকানোই আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সে নামতে চাইছে গাড়ি থেকে, আর কেন, তা বলাই বাহুল্য। দেখলাম, রানি ভয়ে পেয়ে গিয়েছে। মানুদা হাত বাড়িয়ে পিতুকে নিরস্ত করল। তারপর গাড়ি ব্যাকগিয়ারে নিয়ে পিছিয়ে দিল। সাঁকোর বাইরে আমাদের গাড়ি আসতেই গুন্ডা ছ'জন আবার তাদের গাড়িতে উঠল। কী হাসি তাদের। এইভাবে নোংরামি করে, নোংরা লোকদেরই আনন্দ হয়। বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে সাঁকোটা পার করার পর জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দাড়িওয়ালা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, তার কালচে-ছাতাপড়া দাঁতগুলো বের করে বলল, "দ্যাট্স লাইক এ গুড বয়।"

পিতু চোয়াল শক্ত করে, চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তার হাতের মুঠি টানটানভাবে বন্ধ। বুঝলাম, অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত রেখেছে শুধু মানুদার কথায়। ওয়াগন-ভ্যানটা ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যেতেই অভিমানভরা গলায় সে মানুদাকে বলল, "মানুদা, তুমি সত্যিই ম্যাধা আছ বটে। আমারে আটকালা ক্যানে? দেখিন দিতাম উরা কত বড় মস্তান আছে। ছি-ছি-ছি।"

অদ্ভুত ঠান্ডা মাথা মানুদার। সে মৃদ হেসে বলল, "পিতু, কয়েকটা অভদ্র, ইতর লোকের জন্য আমাদের এই সুন্দর দিনটা নষ্ট করার কি কোনও মানে আছে? কী দরকার সব সময় মাথা গরম করার। ভুলে যা সব। আমরা এখন পিকনিক করতে যাচ্ছি।"

পিতু তাও গজগজ করছিল। শেষে রানি বোঝাতে সে নিরস্ত হল। আমাদের গাড়ি ছুটে চলল।

কালীমন্দিরের বাগানবাড়িটি অসাধারণ। বাগানবাড়ি বললে ভুল হবে। এ এক দ্রষ্টব্য জায়গা। প্রায় একরতিনেক জায়গার উপর এই বাগানবাড়ি। বাগানবাড়ি বললে ভুল হবে। চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মাঝে কাকচক্ষু ছোট দিঘি। দিঘির মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়ানো এক কালীমন্দির। তার চারপাশে বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম। সেখানে যাওয়ার জন্য একটা নৌকো আছে। দিঘির তিনপাশ শাল, সেগুন, আম, জাম, কাঁঠালের গাছে ভরপুর।



একদিকে সুদৃশ্য বাগান। ছোট-ছোট করে ছাঁটা ঘাস। গোলাপ, জবা, মল্লিকা, রংগন, গন্ধরাজ, আরও কত রকমের ফুলের কেয়ারি। এদিক-ওদিক ফুলকপি, আলু, গাজর, বিট চাষের জায়গা। দুটো ট্রাক্টরও দাঁড়িয়ে আছে। দিঘির একপাশে একটা ছোট একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে বাঁধানো চাতাল। সেখানে অনেক চেয়ার-টেবিল পাতা, বসার জন্য। বড় লোহার গেট একটাই গোটা জায়গার মধ্যে। গাড়ি গেটের কাছে থামতেই রানি একছুটে নেমে চকিতা হরিণীর মতো ছুটে গেল সামনে। তারপর চেঁচিয়ে কারও উদ্দেশে ডাকল, "করুণাকাকু, করুণাকাকু, দ্যাখো কাদের এনেছি।"

এক মধ্যবয়স্ক বেঁটেখাটো গোঁফওয়ালা লোক এগিয়ে এল। পরনে খাটো ধুতি ও ফতুয়া। হাতে একটা কাস্তে, তাতে মাটি লেগে আছে। এসেই রানিকে দেখে একগাল হেসে গেট খুলতে-খুলতে বলল, "আরে এসো ছোটি মালকিন, এসো এসো।"

মানুদা গাড়িটা গেট থেকে একটু ভিতরে এনে স্টার্ট বন্ধ করল। করুণা হাত জোড় করে আমাদের উদ্দেশে বলল, "হাপনেরা রাজাবাবুর বাড়ি এয়েচেন জানতি পেরেছিলাম। ইবারে দর্শন হল। আমার নাম করুণা লেট আছে। হেই বাগানটাকে হামিই দেখাশোনা করিয়ে। ইখানে অনেক গুণী-মানী লোক আছেন। হাপনেরা আসেন ভিতরে।"

বাংলোর চাতালে এসে করুণা বাংলোর গুণী-মানীজনদের ডেকে আনল বাইরে। এই বাংলোটা এখন একটা বৃদ্ধাশ্রমের মতো। চলে কাকাবাবুর পয়সায়। পুরনো আমলের যাঁরা বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন, তাঁরা এখানে আশ্রিত। আলাপ হল বিরাশি বছরের বলরাম সূত্রধরের সঙ্গে এবং একই বয়সি হলধর দাসের সঙ্গেও। যাঁদের দাদুরা বরদা ভবন তৈরি করেছেন। বলরাম কাঠের এবং হলধর রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। লোহার যত কাজ ছিল, করেছেন আশি বছরের সাধন কর্মকারের দাদু। আছেন মনসাদেবী, বয়স এখন পঁচাত্তর বছর। তিনি ছিলেন সূর্যকান্তবাবুর মায়ের খাস পরিচারিকা। তিনিই নাকি কোলেপিঠে করে বড় করেছেন তাঁকে। যশোদাবাঈ, সাতাত্তর বছর। তিনি ছিলেন কাকাবাবুর দাদু, বগলাকান্তের রাজনর্তকী। এখনও যথেষ্ট শক্ত। দুধে-আলতা চেহারা। এককালে অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন বোঝাই যায়। কাকাবাবুর বাবা তাঁকে বোন পাতিয়েছিলেন। বগলাকান্ত সেই যুগেও ছিলেন সংস্কারমুক্ত, তাই যশোদাদেবীর বিয়ে দিয়েছিলেন পণ্ডিত রামস্বামী আয়েঙ্গারের সঙ্গে। তালবাদ্য ও মার্গসংগীতের বড় শিল্পী। মাদ্রাজি হয়েও লখনউ ঘরানার সংগীতে তিনি ছিলেন পণ্ডিত। বগলাকান্ত মারা যাওয়ার পর কাকাবাবুর বাবা অমলাকান্তের অনুরোধে তিনি ও যশোদাবাঈ এখানে থেকে যান। তাঁদের কোনও সন্তান হয়নি। আছেন মাখন সমাদ্দার। এখন বয়স আশি বছর। বগলাকান্তের আমলের লোক। পরে অমলাকান্তের নায়েব ছিলেন। আর-একজন এক বিশালদেহী বৃদ্ধ। লম্বায় অন্তত সোয়া ছ' ফুট। এখন একটু কুঁজো হয়ে গেছেন। পাকানো বিশাল গোঁফ। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। নাম বৃকোদর যাদব। বয়স পঁচাশি বছর। যিনি বগলাকান্তের আমলের লেঠেল ছিলেন। পরে অমলাকান্তের দেহরক্ষী ছিলেন। শেষজন গজেশ সামন্ত। ইনি রাজভৃত্য নন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। জ্যোতিষী ও জাদুকর। নানা জায়গায় জাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়ান। রাজাবাবুর ছেলে রতিকান্ত তাঁর ম্যাজিক দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল। একা মানুষ। তাই তাঁর অনুরোধমতো কাকাবাবু তাঁকে এখানে থাকতে দিয়েছেন। মাসের মধ্যে বিশ দিন তিনি বাইরেই থাকেন। সকলের সঙ্গে আলাপ হল। সবাই সজ্জন ব্যক্তি। পুরনো আমলের অনেক কথা শুনলাম। আমরা সবাই মিলে পণ্ডিত আয়েঙ্গারকে বাজাবার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বাজাতে চাইছিলেন না। রানি চেপে ধরায় তিনি ভিতরের ঘর থেকে সরোদটা আনতে বললেন। আমি, নন্তু ও বাঘা মিলে সরোদ, ডুগি-তবলা ও ঢোল আনলাম। তারপর তানপুরা আনলাম। আমাদের মধ্যে বাঘা ভাল তবলা বাজায়। নন্তু ঢোল নিয়ে বসল। তারা পণ্ডিতজিকে প্রণাম করে ঢোল ও ডুগি-তবলা বাঁধতে লাগল। রানি তানপুরা বাজাতে বসল। আয়েঙ্গারজি ধরলেন বাগেশ্রী। একাশি-বিরাশি বছরের পণ্ডিত সুন্দরস্বামী আয়েঙ্গার যখন সরোদ বাজাতে শুরু করলেন, তখন মনে হল তিনি যেন তাঁর যৌবনের দিনে ফিরে গেছেন। আলাপ থেকে ঝালা প্রায় একঘণ্টা বাজালেন। কানে মনে হল কেউ অবিরলধারায় অমৃত ঢালছে। আয়েঙ্গারজি থামলেন। সারাঘরে ছড়িয়ে পড়ল নিঃশব্দ তারিফের এজাহার।

তিনি আজকাল বড় একটা বাজান না। আত্মপ্রচারবিমুখ এই অসাধারণ প্রতিভাধর অনায়াসে রবিশঙ্কর, আমজাদ আলি খানদের পাশে জায়গা করে নিতে পারতেন। নিজের অজান্তেই যেন বলে ফেললাম, "পণ্ডিতজি, আর-একটা বাজান।"

তিনি তাঁর মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, "আজ নয় বেটা। আবার একদিন এসো, বাজাব।"

সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে আমরা বাইরে এলাম। এখানকার আর-একজন বাসিন্দার কথা বলা হয়নি। তিনি শিউপুজন মিশ্র। মন্দিরের পুরোহিত। লম্বা, দোহারা চেহারা। মাথার চুল কদমছাঁট। টিকি আছে, তাতে ফুল গোঁজা। বয়স ষাট-বাষট্টি। করুণাকাকা আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, "পূজা তো সুবা হইয়ে গেসে। এখন চলো, সব দিখায়ে দিব। ইয়ে করুণা লা খোল।"

দিঘির পাড়ে মন্দিরে যাওয়ার জন্য একটা সুন্দর নৌকো বাঁধা আছে। আধুনিক নৌকো। দাঁড়ের বদলে প্যাডেল আছে। করুণাকাকা এ-ব্যাপারে অভ্যস্ত। আমরা শিউপুজনজিকে নিয়ে দিঘির মাঝখানে মন্দিরে এলাম। দিঘি বেশ গভীর। জল কাচের মতো পরিষ্কার। বছর-বছর এই দিঘি ঝালাই করা হয়। মোটা লোহার ফ্রেমে গোটা মন্দিরটার কাঠামোটা ধরা রয়েছে। জলের নীচে লোহার পিলার দিয়ে সেই কাঠামো ধরে রাখা হয়েছে। বরদাকান্তের বাবা যমুনাকান্তের সময় এই মন্দির তৈরি হয়। সে আঠারশো খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকের ব্যাপার। বিদেশ থেকে লোহার ফ্রেম ও পিলার জাহাজে করে আনা হয়েছিল। এতদিন পরেও কোথাও মরচে পড়েনি।

মন্দিরটা ছোট। উপরে গম্বুজ। তাতে একটা ঝকঝকে কলসি উলটো করে আটকানো। মঙ্গলের প্রতীক। চারপাশে দিঘির জল টলমল করছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা কালো পাথর দিয়ে ঢাকা ফরাস। যা দাঁড়িয়ে আছে সেই লোহার ফ্রেমের উপরে। গোটা মন্দিরটা চকচকে সোনালি পেন্টে ঝকঝক করছে।

কষ্টিপাথরের হাততিনেক শ্মশানকালী মূর্তি। কোন শিল্পীর হাতের কাজ কে জানে? শরীরের প্রত্যেকটি ভাঁজ নিখুঁত। নিরাবরণা দেহ। একহাতে খড়্গ, অন্য হাতে নরমুণ্ড। কটিতে কাটা হাতের মালা। বিস্ফারিত জিভ, লাল টকটকে। বোধ হয় সিঁদুরলেপা হয়েছিল। বেদিতে দুটো রুপোর পিলসুজ, প্রদীপ জ্বলছে। জবা ফুলের অর্ঘ্যে কালীমায়ের পদতল লালে লাল। আমরা প্রণাম করলাম। পিতু ও নেবু সাষ্টাঙ্গে। শিউপুজনজি আমাদের প্রসাদি ফুল ও বরফি দিলেন। আমরা মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদ খেলাম। করুণাকাকা এসে আমাদের হাতে সাদা গুঁড়োমতো কী গুঁজে দিয়ে বলল, "ইদিকে এসো বাবুরা, মাছ দিখাব।"

আমরা ফরাসের রেলিং-এ ঝুঁকে মাছের খাদ্য সেই গুঁড়োগুলো তার নির্দেশমতো জলে ফেললাম। করুণাকাকা ও শিউপুজনজি মুখ দিয়ে অদ্ভুত "চু-চু-চু—তিক-তিক-তিক—" আওয়াজ করতে লাগল। একটু পরেই দেখি দুটো বিশাল মাছ ভেসে উঠেছে জলের উপর। এত বড় রুইমাছ জীবনে কখনও দেখব কল্পনা করিনি। রুইমাছটা অন্তত পাঁচ ফুট হবে লম্বায়। আর অন্যটি কাতলা। তিনিও অন্তত সাড়ে চার ফুট। চকচক করছে তাদের গায়ের আঁশ। পাখনা দুলিয়ে তারা তাদের খাবার খাচ্ছে। রুইমাছের নাকে সোনার রিং। তাতে লাল-নীল পাথর ঝলমল করছে। কাতলাবাবুর দুই কানকোতেও সোনার দুল আছে। তাতে সবুজ পাথর ঝলমল করছে। করুণাকাকা বলল, "হেই মাছগুলো বাবুর ভীষণ প্রিয়। তিনি প্রত্যেক অমাবস্যের দিন এসে মন্দিরে পুজো দেন আর নিজের হাতে মাছগুলারে খাওয়ান। এ মাছ কখনও ধরা চলবে না।"

তারপর গাড়ি থেকে বিশাল হটপটটা আনা হল। সজোরে স্টিরিও চালানো হল। বাজছে আদনান স্বামীর 'তেরি উঁচি শান হ্যায় মৌলা, মেরি আর্জি মানলে মৌলা'। পিতুর প্রিয় গান। বিপুল চিৎকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে পিতু, নেরু, বাঘা ও নন্তর প্রলয়নৃত্য। করুণাকাকাও বোকা-বোকা হাসি নিয়ে সেই নাচ দেখছে। রানি নাচের তালে হাততালি দিচ্ছে। মানুদাকে দেখলাম, অনেকটা দূরে কী যেন করছে মাটিতে হাঁটুমুড়ে বসে।

আমি গেলাম তার কাছে। দেখলাম সে একটা আমগাছের পাশে বসে ছুরি দিয়ে মাটি তুলে তুলে ম্যাগনিফাইং লেন্স দিয়ে কী যেন দেখছে। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে উত্তর দিল, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। এই অঞ্চলের সব জায়গাই পাথুরে লালমাটির। এই দিঘি ও তার চারপাশের জায়গা অন্তত আড়াই-তিন একর হবে। এই জায়গার সঙ্গে বাইরের পাথুরে মাটির জমির কোনও মিলই নেই। দিঘির জলতল এখন কম। পুকুরের জলতলের উপরে লক্ষ কর মাটির রং কেমন ছাই-ছাই ধরনের। মাটিতে মনে হল হাল্‌কা রসুনের মতো গন্ধ পাচ্ছি। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। মাটির পরিবর্তনটা অদ্ভুত ধরনের। পাঁচিলের বাইরে কিছু দূর এই রকম। তারপর যা দেখতে পাবি তা পাথুরে লালমাটি। মনে হচ্ছে কালচে মাটির বিপুল এক স্তূপ কে যেন কোনওভাবে বিরাট এক গর্ত করে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। প্রকৃতির এ এক বিশাল রহস্য। আমি এর উত্তর পাচ্ছি না।"

পিতুদের নাচগানের পালা শেষ। একটা বেজে গেছে। আমরা খাবার জন্য রেডি হতে লাগলাম। হটপট থেকে খাবার বের করা, থার্মোস্ট্যাটিক টিফিনক্যারিয়ার খোলা, জল গ্লাসে-গ্লাসে সাজানো, সব রানি করতে লাগল। এত বড়লোকের মেয়ে অথচ কোনও দেমাক নেই।

করুণাকাকা আমাদের সঙ্গে বসতে চাইছিল না। অনেক কষ্টে তাকে ম্যানেজ করা হল। এর মধ্যে দুটো অমলেট নেরুর পেটে ঢুকে গেছে। আজ সে নিজের ফর্মে আছে। খাওয়ার ব্যাপারে তার কোনও ভদ্রতার বালাই থাকে না। গত কালকের মতো ন্যাকামি সে আশা করি আর কখনও করবে না।

ন'টা বড় থালায় ফ্রায়েড রাইস ও বাটিতে ফুলকপির তরকারি, রুইমাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি, ছানার ডালনা, এঁচড়ের ছক্কা, স্যালাড সাজানো হয়েছে। আসার সময় তিলক খুব ভালভাবে গুছিয়ে দিয়েছে। আমাদের এই অভিনব বনভোজন যে দারুণ জমবে তাতে আর সন্দেহ কী?

রানি এবার লাফিয়ে উঠে বলল, "আরে, আইসক্রিমের পটটা যে গাড়ির মধ্যে পড়ে আছে। যাই নিয়ে আসি।"

নেরু বলল, "আমিই যাইত্যাছি।"

তার আগেই রানি ছুট লাগিয়েছে। গেটের কাছেই আছে গাড়িটা।

হঠাৎ গাড়ির কাছ থেকে রানির আর্ত চিৎকার ভেসে এল। তাকিয়ে দেখি, আমাদের গাড়ি থেকে ফুটকুড়ি দূরে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। তার ইঞ্জিন চলছে। দুটো ষন্ডামতো লোক দাঁড়িয়ে। একজন রানির মুখে রুমাল চেপে ধরেছে। আর-একজন রিভলভার হাতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

অসাধারণ রিফ্লেক্স পিতুর। আমরা কিছু বোঝার আগেই সে শিকারি চিতার মতো সামনে এগিয়ে চলেছে বিদ্যুতের বেগে। আমার হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গেছে তখন। কারও মুখে কোনও কথা নেই। কয়েক লহমার মধ্যে পিতুর পেশিবহুল শরীরটা ঘাসের উপর স্প্রিন্ট করে পলকের মধ্যে ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে গেল সামনে। রিভলভারধারী কোনও সুযোগই পেল না। পিতুর ডান পায়ের জোর কিক আছড়ে পড়ল তার কলারবোনের উপর।

খট করে একটা শব্দ হল। বোধ হয় হাড় ভাঙার। উহ্‌ বলে চিৎকার করে রিভলভারধারী ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। তার হাত থেকে রিভলভার ছিটকে গেল। পিতু মাটিতে পড়েই দু'বার রোল করে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অন্য লোকটা রানিকে ছেড়ে দিতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। বুঝলাম, রানি অজ্ঞান হয়ে গেছে। লরিটা আস্তে-আস্তে চলতে শুরু করেছে। প্রথম গুন্ডাটা ঘাড় চেপে ধরে লরির মধ্যে উঠে পড়ল। মানুদা সামনে ছুটে চলল, পিছনে আমি। আর কে কী করছে জানি না।

পিতু দু' পা ফাঁক করে ডান হাত উপরে তুলে স্টান্স নিয়েছে ততক্ষণে। বুঝলাম, সে এবার আক্রমণ করবে। সে চকিতে লোকটার ঘাড় লক্ষ করে একটা চপার কষাল। এবার আমাদের বিস্মিত হওয়ার পালা। লোকটা বাঁ দিকে সরে গিয়ে সেই মারাত্মক মারটা কাউন্টার করল। পরক্ষণে ডান পা তুলে একটা প্রচণ্ড কিক ঝাড়ল পিতুর মুখ লক্ষ করে। আমরা শিউরে উঠলাম। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম উৎকণ্ঠায়। চোখ খুলে দেখি, পিতুর মাথাটা নোয়ানো, সে 'ডাক' করে মারটা এড়িয়ে গেছে। কিকটা বেসামাল হতেই পিতু সাংঘাতিক এক জ্যাব বসাল লোকটার মুখে। গুন্ডাটা আর্তনাদ করে উঠল। তার ডান দিককার চোখের কোনা ফেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। গুন্ডাটা হিংস্রভাবে তাকাল তার দিকে, তারপর বিকট 'ইয়া-য়া-য়াহ'



আওয়াজ করে লাফিয়ে উঠে ডান হাতের আঙুলগুলো জড়ো করে চালিয়ে দিল পিতুর দিকে।

এটা ক্যারাটেশাস্ত্রের এক নিষিদ্ধ মার। এই মার আঘাত করে ক্যারোটিড-ট্রায়াঙ্গল-এ ঠিক গলার পাশে। এখানে এক বড় স্নায়ু আছে, যার নাম ভেগাস নার্ভ। এই স্নায়ুতে সহসা বড় ধরনের আঘাত হলে হৃৎপিণ্ডের উপর চরম চাপ আসে। প্রতিপক্ষ সাময়িক অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। আঘাত সেরকম হলে প্রতিপক্ষ মারাও যায়।

কিন্তু কী ক্ষিপ্রগতি পিতুর। রাবারের ব্যান্ড যেমন টেনে ছেড়ে দিলে ছিটকে যায়, ঠিক তেমনভাবে সে একপাশে সরে গিয়ে বাঁ হাত দিয়ে এই নিষিদ্ধ মারটা রুখল। কিন্তু লোকটা এই ফাঁকে বাঁ হাতের মুঠি দিয়ে একটা ঘুসি মারল পিতুর গালে। পিতু টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতেই সে চকিতে ছুটে গিয়ে লরির মধ্যে ঢুকে পড়ল। লরিটা গতি বাড়িয়ে দিল।

মানুদার গলা পেলাম, "সুমে, তোরা রানিকে দ্যাখ। পিতু চলে আয় আমার সঙ্গে। গাড়িতে ফলো করব ওদের।"

মানুদা গাড়িতে স্টার্ট দিল। পিতু উঠতে গিয়ে মানুদাকে বলল, "কী করে ফলো করব? বদমাশরা একটো চাকার বাতাস বের করি দিয়্যাছে।"

মানুদা তাকিয়ে দ্যাখে, পিছনের একটা চাকায় হাওয়া নেই।

আমরা অবাক হয়ে পিতুর দিকে তাকালাম। স্কুলে পড়াশোনায় লবডঙ্কা, খেলাধুলোয় সবেতে ফার্স্ট পিতুকে খেলার মাঠের বাইরে কেউ পাত্তা দিত না তার অদ্ভুত কাজ আর গ্রাম্য ভাষার জন্য। সেই পিতু কীভাবে আমাদের হিরো হয়ে উঠল। অসাধারণ নার্ভ রানিরও। জ্ঞান হওয়ার পরে একটু ধাতস্থ হয়ে সে আইসক্রিমের পটটা বয়ে আনল। তারপর হেসে বলল, "যা হওয়ার হয়ে গেছে। এতে আমাদের পিকনিক কেন মার খাবে? চলে এসো সবাই, আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।"

খাওয়াদাওয়া যা হওয়ার হল। বাংলোর ভিতরের বয়স্ক মানুষরা কিছু টের পাননি মনে হয়। সাক্ষী একমাত্র করুণা। তাকে ভাল করে মগজ ধোলাই করে দিয়েছে পিতু। মানুদা পিতুর সাহায্যে স্টেপনি খুলে পিছনের চাকায় লাগিয়ে দিল। এবার আমাদের ফেরার পালা। মানুদা বেশ গম্ভীর হয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। একটু পর মানুদা বলল, "এত বড় একটা ব্যাপার চেপে যাওয়া ঠিক হবে না। কাকাবাবুকে সব বলতে হবে। আমিই বলব।"

আমার মাথায় হঠাৎ এল একটা কথা। কেউ সেই লরির নম্বর দেখে মনে রেখেছে কিনা? এই অঞ্চলে লরি খুব একটা চলে না। নম্বর জানলে লরির মালিককে বের করা যেতে পারে। আমি জিজ্ঞেস করতেই সকলে জানাল ঘটনার আকস্মিকতায় তখন ওই কথা কারও মাথাতেই আসেনি। মানুদা বলল, "ডাকাতরা পালিয়ে গেল। এখন আর এ-নিয়ে ভেবে কী হবে?"

পিছন থেকে রানি খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল, "চোর পালিয়েছে তাই এখন সকলের বুদ্ধি বাড়ছে।"

দারোগা রমেশ মজুমদার

সমস্ত কিছু জানার পরে ভীষণ মুষড়ে পড়লেন সূর্যকান্তবাবু। সঙ্গে-সঙ্গে ড্রাইভার কুলদীপ সিংহকে ডেকে পাঠিয়ে কী একটা চিঠি লিখে তাকে পাঠালেন গাড়ি নিয়ে। তারপর একটা সোফায় বসে পড়লেন ধপাস করে। পিতুর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "বাবা পিতু, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি ইনস্পেকটর মজুমদারকে আনতে লোক পাঠালাম। তোমরা এবার গিয়ে বিশ্রাম করো। আমি এখন একটু একা থাকতে চাইছি।"

ঘরে আসার পর নিজেদের বেশ অপ্রস্তুত মনে হতে লাগল। আমি, নন্তু, ভুতো শুয়ে পড়লাম। পিতু ঘরের বাইরে পায়চারি করতে লাগল। নেরু ও বাঘা জানলার ধারে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। শুয়ে-শুয়ে দেখলাম মানুদার ল্যাপটপ চালু হয়ে গেছে। টকাটক কী যেন টাইপ করছে। কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু। দুবেজির কথায় ঘুম ভাঙল। তিনি আমাদের নীচে যাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছেন। ইনস্পেকটর মজুমদার এসে গেছেন। কাকাবাবু খবর পাঠিয়েছেন।

নীচে নেমে দেখি দারোগাসাহেব এসে গেছেন। উচ্চতা বড়জোর পাঁচফুট চার-সাড়েচার ইঞ্চি হবে। নাকের নীচে নধর কাঁচাপাকা গোঁফ। ভুঁড়ি আছে একটু। সব মিলে তাঁকে একটা পাকা টম্যাটোর মতো দেখতে লাগে অতিরিক্ত ফরসা হওয়ার জন্য। সোফার পিছনে একটা চেয়ারে বসে আছেন আমাদের পূর্বপরিচিত গজানন চৌবে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কনস্টেবল অর্জুন সিংহ। দুই কুম্ভকর্ণ। তারা আমাদের দেখে দেঁতো হাসি হাসল। এ ছাড়া যাঁরা সোফায় বসে আছেন, তাঁদের ফোটোগ্রাফ রানির কাছে দেখেছি। এখন চাক্ষুষ করলাম। কাকাবাবুর বন্ধুরা—করঞ্জাক্ষ ভট্টাচার্য, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে বড় পোস্টে চাকরি করতেন। শিকারি ছিলেন। বহু দেশ ঘুরেছেন। পেটা, ব্যায়ামপুষ্ট চেহারা। বয়স বোঝা যায় না। নগেন হালদার, রোগা, লম্বা, চোখে ভারী চশমা, চোখগুলো বসা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। ধান-চালের ব্যবসা করেন। ধানমিল আছে দুটো। তেজারতির কারবারও করেন। এ ছাড়া রয়েছেন গজেশ সামন্ত ও পুরনো নায়েব মাখন সমাদ্দার।

দারোগা রমেশবাবু রুপোর নস্যিদান থেকে নস্যি নিয়ে নাক মুছলেন একটা নোংরা রুমালে, তারপর ভাবালু গলায় বলে উঠলেন, "হ্যাঁ। কী যেন নাম ছেলেটার? ইয়ে, মানে পিতু। কী আশ্চর্য, কোন ছেলেটা?"

আমি আঙুল তুলে পিতুকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি একইভাবে বললেন, "তোমাকে দেখে তো, মানে কিছুই বোঝা যায় না, অথচ কী আশ্চর্য সাহসী তুমি। মানে তোমার মতো বীর ছেলে আজকের যুগে বিরল। কী আশ্চর্য, তোমাকে দেখে যে আমার মনে কী আনন্দ হচ্ছে।"

আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁর আলাপ করানো হল। তিনি প্রত্যেকবারই ইয়ে, মানে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এবার তিনি রিভলভারটা দেখতে চাইলেন। সেই রিভলভারটা কাকাবাবুর কাছে জমা দিয়েছিল মানুদা। মুন্সি, কেদার মিশ্রকে ব্যাপারটা বলতেই তিনি তখনই টেবিলের উপর রুমাল জড়ানো রিভলভারটা রাখলেন। রমেশবাবু একবার সজোরে হেঁচে নিয়ে



রুমাল খুলে দেখলেন সেটা। তারপর ছোট্ট এক তুড়িলাফ দিয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য! এ তো দামি আমেরিকান রিভলভার। ইয়ে মানে এই যন্ত্র এই জায়গায় এল কী করে? আশ্চর্য!"

ঠিক সেই মুহূর্তে ঢুকলেন প্রাণগোপাল রক্ষিতমশাই। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। পরনে চকোলেট কালারের সাফারি সুট, মুখে টোবাকো পাইপ। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িগোঁফ। চুল ব্যাকব্রাশ। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বড় অফিসার ছিলেন। কাকাবাবুর বন্ধু। ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে বছরদুয়েক হল এখানে বাড়ি করে আছেন। চুল-দাড়ি কুচকুচে কালো, বোধ হয় কলপ করেন।

রক্ষিতমশাই গজেশ সামন্তের পাশে বসলেন এসে। আমাদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাইপে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "তোকে আগেই সাবধান করেছিলাম সূর্য, আমার কথায় কান দিসনি। রানিকে নিয়ে কারা গিয়েছিল?" একবার আমাদের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে কদর্যভাবে বললেন, "এরা বুঝি? যত্তসব...।"

রক্ষিতের গলার স্বর খুব কর্কশ। অনেকটা কাকের মতো। ওঁর কথায় আমাদের যথেষ্ট আঁতে ঘা লাগল। মানুদা গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, "মি: রক্ষিত। আপনার সঙ্গে আলাপ ছিল না, রানির কাছে আপনার ছবি দেখেছি ও পরিচয় পেয়েছি। সমস্ত কিছু না জেনে এ-ধরনের মন্তব্য করছেন কেন? আপনার কি ধারণা, সবকিছুর জন্য আমরাই দায়ী?"

কাকাবাবু হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন, "প্রাণগোপাল, এরা প্রত্যেকে আমার সম্মাননীয় অতিথি। তুই প্লিজ, মাথা ঠান্ডা করে বোস। তুই জানিস না এরা না থাকলে আজ কী সাংঘাতিক অবস্থা হত। মানু, তোমরা ওর কথায় কিছু মনে কোরো না। ও ভীষণ ভালবাসে রানিকে, তাই না জেনে...।"

তাঁর কথা শেষ না-হতেই রমেশবাবু বেশ কড়া ভাষায় বলে উঠলেন, "টেক কেয়ার এভরিবডি। মানে রক্ষিতমশাই, আমি সরকারিভাবে এই কেস ইনভেস্টিগেট করতে এসেছি। কী আশ্চর্য...আপনি অযথা কিছু না জেনে এই ছেলেদের সম্বন্ধে উলটোপালটা বলছেন কেন? ইয়ে মানে এরা ভীষণ সাহসী। আমি জানি এদের ব্রেভারির কথা। কী আশ্চর্যভাবে তারা এক হনুমানের কাছ থেকে গজাননের রিভলভার উদ্ধার করেছিল। মানে এই ছেলেগুলো আশ্চর্য রকমের। আপনি বসে কথা শুনুন। কথা আমি বলব।" বুঝলাম ওই লাল-টম্যাটোর মধ্যে যথেষ্ট পারসোন্যালিটি আছে।

রমেশবাবু পিতুকে ও মানুদাকে সামনে ডেকে আদ্যোপান্ত সব বিবরণ শুনলেন। ডাকা হল রানিকেও। সে তার স্বভাবসুলভ প্রগলভতা দিয়ে জানাল, "পিতুদা একটা জিনিয়াস। আমার নাকে কী একটা গন্ধ লাগাতে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। ইস, পরে শুনলাম পিতুদার ফাইটের কথা। পিতুদাই তো বদমাশ লোকগুলোকে খুব মেরেছে। জানো দারোগাজেঠু, পিতুদা ঠিক ব্রুস লির মতো কুংফু জানে।"

রানিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রমেশবাবু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, "আপনাকে এবার বিশেষ কয়েকটা প্রশ্ন করছি। মানে ইয়ে, আপনার অসুবিধে থাকলে আলাদা করে আপনাকে একা মানে...।" কাকাবাবু ইঙ্গিত বুঝে বললেন, "না, না। এখানে সবাই



আমার পারিবারিক বন্ধু। আপনি নিশ্চিন্তে প্রশ্ন করতে পারেন।"

মানুদা আমাদের ইশারা করতেই আমরা উঠে পড়লাম। কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "না, তোমরা আবার উঠছ কেন? বোসো। সব কথা তোমাদেরও জানা দরকার।"

আমরা বাধ্য হয়ে বসে পড়লাম। কাকাবাবু এবার শুরু করলেন, "বাবা মানু, তোমরা আসার পর আমি বলেছিলাম যে, তুমি আমার চিঠি পেয়েছ কিনা? আসলে আমি চাইনি তোমরা এই সময় এসো। আমি চিঠিতে জানিয়েছিলাম এখন না আসতে। পরে আমি নিজে গিয়ে তোমাকে, তোমার দাদা ডাঃ রায়, তোমার বউদি ও তোমার ভাইপোকে নিয়ে আসব। তাই তোমরা আসার পর আমি সিউড়ি গিয়ে ফোন করি ডা: রায়কে। তিনি আবার সেই চিঠি পেয়ে অন্যরকম যাতে না ভেবে বসেন। তোমাদের পৌঁছনোর সংবাদ দিয়ে জানাই যে, কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু অসুবিধে ছিলই। সব কথা বলি। গজেশবাবু মাস-পাঁচেক আগে আমার কুষ্ঠি বিচার করে বলেন যে, আমার নাকি ভীষণ খারাপ সময় আসছে। তাঁর কথামতো একটা দশ রতির পোখরাজ ধারণ করি। তার দিনদশেকের মধ্যে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আমার গেটে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দরোয়ান তাকে রুখে দিলে সে শাপশাপান্ত করতে থাকে। বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। সেও আমাকে জানায় আমার নাকি সাংঘাতিক অমঙ্গল হতে চলেছে। সে একটা কবজ দেয় ধারণ করার জন্য, যাতে নাকি, কিছুটা পরিত্রাণ পেতে পারি।"

"আমি মা-কালীর ভক্ত। আমার মধ্যে কোনও কুসংস্কার নেই। সব কথা আমার বন্ধু প্রাণগোপাল, হালদারমশাই করঞ্জাক্ষ ও নায়েবমশাই মাখন সমাদ্দারকে জানাই। তাঁদের পরামর্শে ঘটা করে কালী মন্দিরে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করি, লোক খাওয়াই। কিন্তু কিছুই ঘটল না মাসখানেকের মধ্যে। তা হলেও আমি কালী মন্দিরের চারপাশে ও এখানকার চারদিকে পাহারা বাড়িয়ে দিই। একা কখনও বাইরে যাই না, সঙ্গে দেহরক্ষী মনোহর থাকে। রানিও যখন স্কুলে যায় সিউড়িতে, তখন তার সঙ্গে যায় কুলদীপ, তার কাছে রিভলভার থাকে, রমেশবাবুই পারমিশন করিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া অন্য ড্রাইভার বাসুদেবও থাকে। এর পর একদিন মুম্বই থেকে এক কম্পিউটারে টাইপ করা চিঠি এল আমার নামে। প্রেরক বিজনেস টাইকুন সন্দীপ শেঠি।"

"কী আশ্চর্য সেই চিঠি আছে আপনার কাছে?"

"আছে, আমার পার্সোনাল ফাইলে। আপনি চাইলে দেখাতে পারি।"

"না, মানে কী আশ্চর্য, আপনি বলে যান, পরে দেখব।"

কাকাবাবু টেবিল থেকে কাচের গ্লাস থেকে একটু জল খেয়ে বললেন, "সন্দীপ শেঠি বিরাট বিজনেসম্যান। খবরের কাগজে নাম বেরোয়। ব্যবসার ব্যাপারে ন্যাশনাল টেলিভিশনে যেসব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাতে মাঝে-মাঝে তাকে দেখা যায়।"

মানুদা বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি কয়েকবার টিভিতে। উনি হুইলচেয়ারে বসে থাকেন। দুই পা প্যারালিসিস। গোলমতো মুখ, মাথা ও মুখ সম্পূর্ণ কামানো। চোখ দুটো সাধারণ মানুষের চেয়ে বড় আর উজ্জ্বল। বসার জায়গার কাছে নানারকমের আগ্নেয়াস্ত্র সাজানো থাকে। মাতৃভাষার মতো তিনি ইংরেজি বলেন।"

গজানন চৌবে আর না থাকতে পেরে মানুদার প্রশংসায় বলে উঠল, "আরিব্বাস বাবুজি। আপ ইতনা ডিটেলমে দেখা? হাম ভি সন্দীপকো দেখা টিভি মে।"

তার উচ্ছ্বাসে জল ঢেলে দিয়ে রমেশবাবু বললেন, "আঃ গজানন, তুমি চুপ করো। তোমার রিভলভার নিয়ে পালায় হনুমানে। কী আশ্চর্য, তুমি ঘুম ছাড়া আর জানো কী? মানে কথা বোলো না।" একটু নস্যি নিলেন তিনি।

কাকাবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে মানুদার দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন, "সন্দীপ একটা দারচিনি, কাজু-এলাচ, লবঙ্গের বাগিচা করতে চায়। সে নাকি সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তার নিজস্ব হেলিকপ্টারে এরিয়াল সার্ভে করেছে। শেষে কালী মন্দিরের ঘেরা জায়গাটা তার পছন্দ হয়েছে সেখানকার ভিডিও-টেপ দেখে। সে এই জায়গাটা কিনতে চায়। যার জন্য সে 'মু-মাংগা' দাম দিতে রাজি আছে।"

"আমি সেই চিঠির জবাব দেওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনি। এসব আমার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। আমার কোনও অর্থাভাবও নেই। মাসদুয়েক আগে প্রাণগোপাল ও করঞ্জাক্ষ রমেশ দেওয়ানকে নিয়ে আমার কাছে ছুটে আসে ভোরবেলায়। ছক্কা-পাঞ্জা ও লালু-ভুলুকে রাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কুকুরগুলো দারুণ চিৎকার করছিল। তাদের বাসুদেও নেটের মধ্যে ভরে দেয়। প্রাণগোপাল বলে, 'সন্দীপ এসেছে বিরাট রোলস রয়েস গাড়িতে। তার পিছনে আট-দশটা টাটা সুমো। তাতে লোক রয়েছে। আমি ও করঞ্জাক্ষ মর্নিং-ওয়াক করতে বেরিয়েছিলাম। আমাদের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোর বাসস্থানের খোঁজ করছিল। আমরা তোর বন্ধু জেনে তুলে নিল গাড়িতে। তারা গেটের বাইরে আছে। কোনও উপায় নাই। তুই প্লিজ, একটু আয়।' কোনওমতে রেডি হয়ে সুশীলাকে বললাম রানিকে যেন নীচে নামতে না দেয়। দেহরক্ষী মনোহর আউট হাউসে থাকে। সে আমার পাশে চলে এল।

"আমি নেমে চাতালটার উপর দাঁড়ালাম। অবতার গেট খুলতেই নেভি-ব্লু রঙের বিশাল রোলস রয়েস ধীরে-ধীরে এসে আমার দশ ফুট আগে দাঁড়াল। টাটা সুমোগুলো বাইরেই থাকল। একই রকমের জিনসের প্যান্ট-গেঞ্জি পরা দশজন লোক বড় গাড়িটার পিছনে-পিছনে মার্চ করার মতো ভিতরে ঢুকল। খটাস করে একটা শব্দ হল। দেখলাম, গাড়িটার বাঁ-দিকের দু' জানলার মাঝের দেওয়াল দু'দিকে সরে গেল। আর ভিতর থেকে চওড়া ধাতব পাটাতন নেমে এসে নীচে ঠেকে গাড়ির সঙ্গে মাটির সংযোগ ঘটাল। সেই পাটাতনের উপর দিয়ে গড়িয়ে নামল চকচকে সোনালি রঙের এক হুইল চেয়ার। তাতে বসে সন্দীপ শেঠি, যার বর্ণনা মানু দিয়েছে। হুইলচেয়ারটি অসাধারণ। পা দুটো দেখা যাচ্ছে না, গোলাকার ধাতব দেওয়াল কোমর অবধি বের করে আছে। তাঁর পরনে হালকা গোলাপি রঙের গেঞ্জি। গলায় হিরে বসানো চেন, বাঁ কানে হিরের টাব। দশাসই চেহারা। তাঁর একটা হাত অবতার সিংহের হাতের দেড়গুণ হবে। চার্জেবল-ব্যাটারি চালিত, কম্পিউটার পরিচালিত হুইল চেয়ার। তাঁর হাতে রিমোট কন্ট্রোল।

"আমার সামনে এসে রিমোটসহ দু'হাত জোড় করে পরিষ্কার

ইংরেজিতে বলল, 'নমস্কার রাজাসাহেব। অধমের নাম সন্দীপ শেঠি। থাকি মুম্বইয়ে। ছোটখাটো বিজনেসম্যান। দেখছেন তো আমি অক্ষম। ভগবান আমার হাঁটার শক্তি কেড়ে নিয়েছেন। আমার মতো অপাহিজকে যদি আপনার মতো রাজা না দেখেন তো দেখবে কে? একটা ছোট আরজি জানিয়ে আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম। আপনি জবাবই দিলেন না। আমার মন খুব নরম। ভীষণ কষ্ট পেলাম মনে-মনে । তাই এই অধম কষ্ট করে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এল আপনার কাছে। আপনার জায়গাটা যদি সেল করেন আমাকে তো এই গরিবের বিরাট উপকার হয়। একটা ছোট বিজনেস খুলতে পারি। তার বিনয়মিশ্রিত কথার খাঁজে-খাঁজে নির্লজ্জ কৌতুক লুকিয়েছিল।

"রিমোট টিপে চারপাশে একটা চক্কর মেরে এসে সে শুরু করল, 'রাজাসাহেব, আমি গরিব লোক। দরদাম করতে পারব না। এখন আপনাকে বিশ লাখ দিচ্ছি অ্যাডভান্স হিসেবে। পরে রেজিস্ট্রির দিন আপনি যা বলবেন দেওয়া যাবে। আর যদি বলেন আজই রেজিস্ট্রি করবেন তো আমি রেডি আছি।'

"এই অজ অখাদ্য জায়গায় একটা আড়াই-তিন একর জমির দাম বিশ লাখেরও বেশি। লোকটা হয় পাগল, নয় কোনও মতলব আছে। আমি বললাম, 'আপনি বেকার অর্থ ব্যয় করে, কষ্ট করে এখানে এসেছেন। এ আমার পূর্বপুরুষের জায়গা। কোনও আর্থিক মূল্যেই এ জায়গা আমি সেল করব না।'

"সঙ্গে-সঙ্গে শিকারি বিড়ালের মতো হাসি হেসে বলল, 'ঠিক আছে। লিজ দিয়ে দিন। পনেরো বছরের জন্য। লেখাপড়া করে দেব। মাসে দু'বার কালী মন্দিরে পুজোও দিতে পারবেন। আপনার লোকেরা যারা ওখানে থাকে তাদের জন্য থাকার আলাদা বাড়ি করে দেব। লিজ নিলেও সেই বিশ লাখই দেব বায়না হিসেবে। কেমন, খুশি তো? আমার বয়স একচল্লিশ। পনেরো বছর নিশ্চয়ই বাঁচব। আপনি বাঁচলে ভাল, নইলে জায়গা আপনার ছেলেমেয়েদের ফেরত দিয়ে দেব। এত ভাল খদ্দের আপনি পাবেন না। রাজাসাহেব কী ভাবছেন?'

"আমি দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর কথা শুনছিলাম। রাগে ঘেন্নায় আমার শরীর রি-রি করছিল। সে থামতেই বেশ কড়াভাবে বললাম, 'মি: শেঠি, টাকার গরম আমাকে দেখাবেন না। আমাদের রাজত্ব হয়তো গেছে, কিন্তু রাজরক্ত এখনও বইছে আমার দেহে। ভাববেন না আমি সহায় সম্বলহীন। বারবার আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই রকম উৎকট আবদার জানালে আমি আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব। আপনি প্রথম বার এসেছেন, তাই যতটা পারি ভদ্রতা করেছি। আপনি এবার সহ্যের সীমার বাইরে যাচ্ছেন। আপনি দয়া করে চলে যান এখান থেকে।'

"ভেবেছিলাম সে চটে যাবে আমার কথা শুনে। সে হো-হো করে হেসে উঠল আমার ভর্ৎসনায়। কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, "আরে মাথা গরম করছেন কেন রাজাসাহেব! সেল করবেন না, লিজ দেবেন না, ঠিক আছে। আমার মতো পঙ্গু লোককে খামোকা বারবার আদালতে ছুটিয়ে নিজের নীল রক্তের শান কেন নষ্ট করবেন? জায়গাটা আমার দরকার ছিল আর আপনি জায়গাটা ছাড়বেন না। ব্যস হয়ে গেল। আমি অনেস্ট-বিজনেসম্যান। আপনাকে বারবার কেন হ্যারাস করব? হাঃ হাঃ হাঃ, যখন এতই চটেছেন তখন না হয় চলেই যাচ্ছি। তবে রাজাসাহেব, আমি মানুষটা খারাপ নই। যদি কিছু মনে না করেন, তবে যাওয়ার আগে আপনাকে একটা সামান্য উপহার দিতে চাই। একদম দামি নয়। সেটা আপনার কাছে থাকবে এই অক্ষমটার স্মৃতি হিসেবে। কী রাজাসাহেব, এই খোঁড়া লোকটার সামান্য একটা উপহার রাখবেন না?'

"আমি তার মনোভাব বুঝতে পারছিলাম না। তাকালাম প্রাণগোপালের দিকে। সেও কিছু বুঝছিল না। তবু ইশারায় আমাকে গ্রহণ করতে বলল, যাতে সহজেই ওই আপদ বিদেয় হয়।

"সন্দীপ এক অদ্ভুত হাসি হাসল। গোমেজ বলে ডাকতে তাঁর বিশালদেহী গোয়ানিজ ড্রাইভার গাড়ির মধ্যে থেকে একটা ভারী স্টিলের প্লেট নিয়ে এল। আড়াই ফুট স্কোয়ার। অন্য একজন ভারী লোহার ফ্রেম নামাল। তাতে প্লেটটা শক্ত করে আটকানো হল। কী যে হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না।

"এবার সে হুইলচেয়ারটা পিছিয়ে ফুট পনেরো সরে গেল। তারপর চেয়ারের সামনের ধাতব দেওয়ালের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বের করল কয়েকটা রিভলভার। তার মধ্যে গুলি ভরল। অকস্মাৎ রিভলভার তুলে প্লেটটার দিকে তাক করে ধড়াম-ধড়াম করে ফায়ার করতে লাগল। একনাগাড়ে চলতে লাগল গুলির শব্দ, আগুন ও ধোঁয়া। গুলি চালানো যেন শেষই আর হতে চায় না। আমার হৃৎপিণ্ডের গতি গেল বেড়ে। কপালে জমল বিন্দু-বিন্দু ঘাম। হাত-পা কেমন ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি বেসামাল হয়ে লুটিয়ে পড়তাম যদি না মনোহর দু' হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরত। রমেশ এক দৌড়ে একটা চেয়ার নিয়ে এল। তাতে বসে একটু সংবিৎ পেলাম।

"ঘরঘর করে চাকা ঘুরিয়ে সন্দীপ আমার সামনে এল। হো-হো করে হাসতে-হাসতে বলল, 'আরে রাজাসাহেব, ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনাকে উপহার দেব বলেই তো এতটা কষ্ট করলাম। গোমেজ, উপহারটা রাজাসাহেবকে দেখাও।'

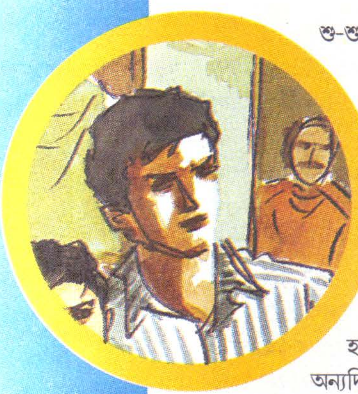
"গোমেজ প্লেটটা আনল সামনে, ভয়ে-বিস্ময়ে দেখলাম তার মধ্যে এক মড়ার খুলি আঁকা বুলেট দিয়ে। সন্দীপ একইভাবে হাসতে-হাসতে মজা করে বলল, 'তা হলে রাজাসাহেব, পছন্দ হয়েছে তো আমার ক্ষুদ্র উপহারটা। রাখবেন ওটা। যখনই দেখবেন তখনই এই খোঁড়া লোকটার কথা মনে পড়বে। আসি এবার গুডবাই। বয়েজ প্যাক-আপ।'

"ভাল করে ধাতস্থ হওয়ার আগেই দেখলাম তাঁর বিশাল রোলস রয়েস গেট ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সামনে-পিছনে টাটা সুমোগুলো। ইঞ্জিনের শব্দ, ধোঁয়া, ধুলো ছড়িয়ে তারা শেষ অবধি চোখের আড়ালে চলে গেল।

"ইয়ে মানে কী আশ্চর্য। সেই প্লেটটা আছে আপনার কাছে?" আবার নস্যি নিয়ে বললেন তিনি।

কাকাবাবু ইশারা করতেই কেদার মুন্সি গিয়ে একটু পরেই আনল প্লেটটা। আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগলাম সেটা। বুলেট দিয়ে আঁকা নরকরোটি। মোট বাহান্নটা বুলেট। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, নিখুঁত কাজ। যদি কেউ মাঝ বরাবর প্লেটটাকে সমানভাবে কেটে ফেলে তবে খুলির দুই অর্ধাংশই হবে অবিকল এক। গলা পেলাম নেবুর, "উঃ, কী অসাধারণ টিপ। ওই হতভাগা অলিম্পিকে যাইলে আমাগো দ্যাশের কয়েকটি সোনার মেডেল বাঁধা আছিল।"

বাঘা বলল, "বে-বে-বেশ কয়েকটা বি-বি-বিশ্ব-রেকর্ড করত



শু-শু-শুটিং-য়ে।"

রমেশবাবু প্লেটটা ধরে নাকের কাছে আনলেন। তারপর বললেন, "ওসব অলিম্পিক-টলিম্পিক মানে কোথাও যেতে হবে না তাকে। কী আশ্চর্য, সব ভুয়ো। মানে প্রত্যেকটা বুলেটের গভীরতা একই। নিখুঁত বাহান্নটা গর্ত। কোনও কোনও বুলেটে ছিটকে যাওয়ার কথা। আশ্চর্যের ব্যাপার বোধ হয় সিকি-সেন্টিমিটার পুরু প্লেটটা। দামি হাই ভেলোসিটির রিভলভার, মানে প্লেটের অন্যদিকে কোনও বুলেট লাগার ক্ষত নেই। অন্যদিক মসৃণ। তার মানে প্লেটটা সে তৈরি করেই এনেছিল। আপনাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য উষ্টুম-ধুষ্টুম ব্ল্যাঙ্ক-ফায়ার করেছে। মানে লোকটা একজন আশ্চর্য ধরনের ধাপ্পাবাজ।"

ওই ছোটখাটো, গোলগাল, মুদ্রাদোষী মানুষটাকে আপাতভাবে কমিক্যাল ফিগার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতায় আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়লাম। মাঝারি হাইটের, ঝাঁটা-গোঁফ ও চওড়া দেহধারী করঞ্জাক্ষবাবু বললেন, "এক্সেলেন্ট দারোগাসাহেব। আমি এতদিন গুলি-বন্দুক নিয়ে কাজ করছি। আমারও মাথায় ধরা পড়েনি এত বড় বুজরুকিটা।"

রক্ষিতমশাই পাইপে ফ্লাইং-ডাচম্যান তামাক ভরতে-ভরতে তাঁর বায়সকণ্ঠে তারিফ করলেন, "বাঃ ইনস্পেকটরসাহেব। সেদিন সূর্যের সঙ্গে আমিও ছিলাম। আর ওই প্লেটটাও বেশ কয়েকবার দেখেছি। এই ধোঁকাবাজির কথা একবারও মনে হয়নি।"

নগেনবাবু বললেন, "এটা না হয় ধাপ্পা। তবে ওই নরকরোটি আঁকা প্লেট উপহার দেওয়ার পিছনে রয়েছে এক বড় রকমের হুমকি। আমার মনে হয় সন্দীপ শেঠি এত সহজে হার মানার লোক নয়।"

হঠাৎ গজানন চৌবে উঠে স্যালুট করে বিনম্রভাবে বলে উঠল, "স্যার, ডাঁটিয়েগা মত। আপ মহান হ্যায় স্যার। ইসকে বাদ হাম হরদম জাগেংগে, শোয়েংগে নেহি। ইয়ে অর্জুন হ্যায় না উসনে মেরা আদত বিগাড় দিয়া। ইয়ে পহেলে শো পড়তা হ্যায়...দেখ-দেখকে ম্যায়ভি শো যাতা।"

"ক্যা বোলতে হ্যায় সাব?" অর্জুন সিংহ কাঁইমাঁই করে উঠল, "নিদ যানা তো ম্যায়নে আপহিসে শিখা।"

"শাটআপ মানে বোথ অফ ইউ।" বিরাট ধমক দারোগাবাবুর, "অ্যান্ড সিট ডাউন কোয়ায়েটলি।" তারপর একটা ছোট চিরুনি বের করে ঝোপের মতো গোঁফটা আঁচড়াতে-আঁচড়াতে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা কী-ই বা করতে পারি? এত বড় এলাকা আর পঁচিশজন মাত্র স্টাফ। এদের মধ্যে এই দুই কুম্ভকর্ণ একটু সাহসী। আর তো সব যাচ্ছেতাই। আপনি আপনার রক্ষীদের মানে ভাল করে হুঁশিয়ার থাকতে বলবেন। আমার কাছ থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য সব সময় পাবেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সন্দীপ শেঠি বেশ বড় মাপের লোক। মানে জোরাল কোনও প্রমাণ ছাড়া ওর এগেনস্টে কিছু করা সম্ভব হবে না। আমি আপনার জন্য সব কিছু মানে এস-পি-সাহেবকে জানাব। দেখা যাক কী হয়?" তারপর আবার নস্যি নিয়ে আমাদের দিকে মুচকি হাসি ছুড়ে দিয়ে বললেন, "আসি মানে ইয়ং বয়েজ। আবার দেখা হবে।" রিভলভারটা তুলে নিয়ে বললেন, "এটা। কী আশ্চর্য, আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি। ইয়ে মানে গুডনাইট জেন্টলমেন। চলো গজানন-অর্জুন।"

গোটা প্রাসাদটায় এক থমথমে পরিবেশ। রাত দশটা অবধি কাকাবাবু, রক্ষিতমশাই, করঞ্জাক্ষবাবু, গজেশবাবু, নগেনবাবু ও নায়েবমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে চলেছিলেন। আমাদের এবার খেতে ডাকল তিলক। গিয়ে দেখি তাঁরা সকলেই বসে আছেন ডাইনিং-টেবিলে। আমাদের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল বসতে। মানুদা বসতে আমরাও একে-একে বসে পড়লাম।

খাবার ভাল করে গলা দিয়ে নামছিল না। কাকাবাবু একটু তরকারি রুটিতে মাখিয়ে মুখে পুরে বললেন, "মানু, তোমাদের বলছি, কিছু মনে কোরো না। আমার খুব দুঃসময় চলছে। প্রাণগোপালও বলছিল, ফিরে যাও তোমরা। আবার সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে আমি নিজে গিয়ে তোমাদের এখানে নিয়ে আসব। রানিকেও ভাবছি ওর মাসির বাড়ি ভাইজাগে রেখে আসব। আশা করি আমার অবস্থাটা তোমরা বুঝতে পারছ।"

রক্ষিতমশাই তাঁর বায়স-স্বরে, রুক্ষকণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই বলেছি সূর্যকে। তোমাদের চলে যাওয়াই ভাল। আর দেখছ তো তোমরা আসার পর কত বড় সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল।"

নগেনবাবু মৃদুস্বরে বললেন, "বেড়াবার পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত সময় নয় এখন। দেখছ তো কী করতে কী ঘটে গেল!"

মানুদা বলল, "আপনারা ঠিকই বলেছেন। যখন মানুষের মন সব সময় এক বিপদের জন্য ক্ষণ গুনছে, সেই অবস্থায় আমরা এসেছি আনন্দ করার জন্য। আনন্দ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা ছাড়া আনন্দ দেওয়াও আপনাদের পক্ষে এই অবস্থায় কোনওভাবেই সমীচীন হবে না। আমরা কালই চলে যাব।"

রক্ষিতমশাই খুব কুৎসিতভাবে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা চলেই যাও। কী দরকার এখন তোমাদের এখানে থাকার? তোমরা আসার পরই দেখছি ঝামেলা বেড়ে গেল।"

হঠাৎ সেখানে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স ঘটাল গোঁয়ার পিতু। বুকে থাপ্পড় মেরে সে রক্তচক্ষু বের করে বলে উঠল, "না, আমি যাবনি। কেনে যাব? রানি আমাদের বহিন আছে। কাকাবাবু বাপ সমান। কত বিপদ হোছে দেখি যাব। কাকা, আপনি বের করি দিলে ঘরের বাহিরে পড়ি থাকব আমি। সবায়েঁ যায় যাক, এই পিতু লড়বেনি ইখান থেকি। আমার গায়ে এক-ফোঁটা রক্ত বাকি থাকতে কাকা আর রানির কোনও ক্ষেতি হতে দিব না, ইটা আমার পিতিজ্ঞা রইল।"

চরম বিরক্তি নিয়ে রক্ষিত বললেন, "যাবে না মানে? সবাই চলে যাচ্ছে কাল, তুমিও যাবে। এখানে থেকে অশান্তি বাড়ানো ছাড়া তোমরা আর কিছু করতে পারবে না, সে আমি ভালভাবেই জানি।"

"আপনি চটরপটর করবেন না। আমি আপনাকে কিছু বুলিনি। আমি কথা বলছি কাকার সাথ। আপনার কথায় হেথায় আসিওনি, যাবও না আপনার কথায়। কাকা পারলে বের করি দিক ঘাড়ধাক্কা দিন।" পিতুর গলায় আগুনের হল্‌কা।

সূর্যকান্তবাবুর মন এই সহজ-সরল-সাধারণ ছেলেটার প্রতি আগে থেকেই ভিজেছিল। পিতু যেভাবে জীবন পণ করে রিভলভারধারী গুন্ডাদের হাত থেকে রানিকে বাঁচিয়েছিল তা থেকে তার প্রতি তিনি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি হাত দিয়ে

রক্ষিতকে নিরস্ত করে ধরা কণ্ঠে বললেন, "দ্যাখো, তোমরা চলে যাও সেটা আমিও মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। কিন্তু তোমাদের বাবা-মা আছেন, আত্মীয়-পরিজন আছেন, যদি খারাপ কিছু ঘটে যায় তাঁদের কাছে জবাব দেব কী করে? মুখ দেখাব কেমন করে?"

এবার আমাদের বন্ধুদের মধ্যে পড়াশোনায় সবচেয়ে ভাল ছেলে ভুতো বলল, "দেখুন কাকাবাবু, এত সব জানার পর কাপুরুষের মতো চলে যেতে আমাদের মধ্যে কেউ রাজি হবে না। তা ছাড়া আমাদের বাবা-মা'রা কখনও চান না আমরা ভীরুর মতো আচরণ করি। আপনি একান্তভাবে চলে যেতে বললে চলে যেতেই হবে। কিন্তু কাকাবাবু, ভেবে দেখুন, আমাদের টিম কখনও ভয় পেয়ে পিছু হাঁটতে জানে না। এই বিপদের মধ্যে থেকে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমরা কৃতার্থ হব।"

তাঁর পিতৃহৃদয় নরম হল সেই কথায়। তিনি একটু ভেবে বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা থাকো কিছুদিন। তবে বাইরে গেলে সব সময় কুলদীপ বা বাসুদেও থাকবে তোমাদের সঙ্গে।"

আমরা উৎফুল্ল হয়ে সমস্বরে প্রায় চেঁচিয়ে বললাম, "ধন্যবাদ কাকাবাবু।"

করালবদনা কালীমাতা

পরদিন সকালে উঠে শুনি ভয়ংকর কাণ্ড হয়েছে কাল রাতে। স্বয়ং মা-কালী নাকি মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভয়ংকরী মূর্তিতে। আয়েংগারজি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সে দৃশ্য দেখে। গজেশ সামন্ত এখনও শয্যাশায়ী। শুধু শিউপুজনজির কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে শুনলাম। তাঁর কথার বাংলা করলে দাঁড়ায়, রাত বারোটার মতো। দিনপাঁচেক পরেই অমাবস্যা। বাইরে বিজলি আলো জ্বলছে, তাও আলো-আঁধারি। শিউপুজনজি বাইরের চাতালে বসে করুণার সঙ্গে গল্প করছিলেন। তেওয়ারি, রামনাগিনা, যমুনাপ্রসাদ ও রঘুবীর চার নৈশপ্রহরী বসে তাস খেলছিল। এ তাদের রোজকার কাজ। হঠাৎ ঘেরা জায়গার ঈশান কোণ থেকে এক সুতীব্র আলোর দ্যুতি এসে পড়ল মন্দিরের চূড়ায়। সে আলো এত তীব্র যে, তাকালে দু'চোখ ঝলসে যায়। চার রক্ষী বন্দুক-বল্লম নিয়ে 'কৌন হ্যায়' বলে সেদিকে যেতে উদ্যত হতেই দ্যাখে, মন্দিরের সামনে থেকে প্রচণ্ড উজ্জ্বল এক বিভীষিকাময়ী কালীমূর্তি পা বাড়িয়ে জলের উপর নামছে। করালবদনা কালীমূর্তি।

চাররক্ষী হাঁটুগেড়ে বসে হাত জোড় করে মাটিতে বসে পড়েচে। শিউপুজনজির চিৎকারে বাংলো থেকে সকলে বেরিয়ে আসেন। আয়েংগারজি ভয়ে আঁতকে উঠে 'আঁ আঁ' শব্দে ভিরমি খেলেন। বৃকোদর না ধরলে তাঁর বড় রকমের আঘাত লাগার আশঙ্কা ছিল। তাকে চাতালে শুইয়ে দেন তিনি। গজেশবাবু ধপাস করে চাতালে বসে পড়লেন। সেই থেকে তাঁর বাক বন্ধ। বৃকোদর অকুতোভয়ে দু'হাত বিস্তৃত করে সবাইকে আড়াল করেন।

হঠাৎ সেই মূর্তি দীঘির জলের উপর দাঁড়িয়ে খলখল শব্দে হাসতে থাকে। তারপর শাঁখের মতো উচ্চগ্রাম শব্দে কথা বলে ওঠে, 'পালা। তোরা সবাই পালা এখান থেকে। সবাইকে...। কেউ বাদ যাবি না। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...।" সেই মূর্তিকে খলখল শব্দে হাসতে দেখে শরীরের রক্ত জমে যাচ্ছিল। বলরাম ও হলধরবাবুরা প্রায় চেতনালুপ্ত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন চাতালের উপর। একা বৃকোদর সবাইকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন অসীম সাহসভরে। আর দু' হাত জোড় করে বলে যাচ্ছিলেন, "রক্ষা কর মা রক্ষাকালী। আমরা তোর অধম সন্তান মা। কোনও দোষ করে থাকলে ক্ষমা করে দিস।"

কালীমূর্তি পায়ে-পায়ে দিঘির জলের উপর দিয়ে সামনে আসতে থাকে। অনেকটা আসার পর আবার শুরু করে সেই ভয়ংকর হাসি। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড উজ্জ্বল হয়ে গিয়ে দপ করে অন্তর্ধান করে।

এই অঞ্চলের একমাত্র পাশ করা ডাক্তার মণীশ চট্টোপাধ্যায় আয়েগাংরজিকে দেখেন। তাঁর চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। গজেশবাবুর জ্ঞান অনেক আগেই ফিরেছিল। কিন্তু তিনি বিস্ময়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেছেন। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। অন্যরাও পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে কাকাবাবু ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। আমরা সবাই তাঁকে ও রাণিকে নিয়ে বাগানবাড়িতে গেলাম। সারা গ্রামে তোলপাড় হয়ে গেছে। স্বয়ং মা-কালী দেখা দিয়েছেন, এ কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বাগানবাড়ি লোকে লোকারণ্য। বহু লোক পুজোর জন্য ফুল-নৈবেদ্য নিয়ে এসেছে। নৌকোয় চড়ে মন্দিরে যাওয়ার পর সব দেখা হল। কোনও পরিবর্তন নেই সেখানে। পনেরো ফুট লম্বা কালীমায়ের পদচিহ্নও কোথাও পড়ে নাই।

গজেশবাবু এতক্ষণে কথা বলা শুরু করেছেন। চোখ বিস্ফারিত করে তিনি বললেন, "আই ডোন্ট বিলিভ ইট, বাট আই হ্যাভ সিন মা-কালী উইথ মাই ওন আইজ। আমি আপনাকে বলেছিলাম রাজাসাহেব, "মা-কালী রুষ্ট হয়েছেন। এখন দেখুন তার প্রামাণ হাতেনাতে মিলল। ওঃ কী ভয়ংকর।

বাগানবাড়িতে বসবাসকারী সকলেরই এক কথা, তাঁরা আর এখানে থাকতে পারবেন না। রাজাবাবু যেন তাঁদের ব্যবস্থা অন্যত্র করে দেন। কাকাবাবু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে কী সব চিন্তা করলেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, "ঠিক আছে। যতদিন আপনাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে দিতে না পারছি ততদিন আপনারা আমার বাড়িতেই থাকবেন। তেওয়ারি, লক্ষ্মণ, তোমরা কী বলছ?"

রক্ষীরা হাত জোড় করে বলল, "রাজাসাহেব, চোর-চক্কা হোতা তো হামলোগ লিফ্‌ট লেতেঁ। পর ইয়েতো মাহামায়াজিকি কোপ হ্যায়। আপহি বোলিয়ে সরকার, হামলোগ ক্যা করে?"

এই সময় মানুদা হঠাৎ শরীর শক্ত করে বলল, "কাকাবাবু, যদি অনুমতি দেন তবে আমরা এই বাংলোয় থাকব। বাসুদেবজি, কুলদীপজিও থাকবে আমাদের সঙ্গে। কী ব্যাপার তা জানার জন্য আমাদের ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। আরাধ্যা দেবী কেন আমাদের প্রাণনাশ করবেন?"

কাকাবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমি আর ভাবতে পারছি না। তোমাদের বাধাও দেব না। যা ভাল বোঝো করো।"

উল্কা-কাহিনি

শিকারি করঞ্জাক্ষ ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে রাজাবাবুর বাড়ির বহির্ভাগের দূরত্ব বোধ হয় চারশো মিটারের মতো হবে। তাঁর বাড়ির সামনেই ছোটখাটো খেলার মাঠ আছে একটা। সেখানে



গ্রামের ছেলেরা সকালে-বিকালে খেলা করে। দু'টো বড়-বড় ওয়াগন-ভ্যান এসে লেগেছে সেখানে। দিনদুয়েক বড় স্ক্রিনে ভিডিও দেখানো হচ্ছে সেখানে। আর আছে সার্কাসের খেলা ও ম্যাজিকের খেলা। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি, গৃহস্থ-বন্ধুরা দলে-দলে দেখতে যাচ্ছে সেখানে। দু'-টাকা করে টিকিট। প্রচুর আনন্দ। গ্রামের একমাত্র ভিডিও হলটি এখন মাছি তাড়াচ্ছে।

সকালবেলা মানুদা ভুতোকে নিয়ে সিউড়ি গেছে, সঙ্গে কুলদীপ। নেরু ও বাঘা টেবিল টেনিস খেলছে। আমি রানির সঙ্গে ভিডিও গেম খেলছি। নন্তু পাশে বসে দেখছে। পিতু নীচের লনে তার প্রাত্যহিক ব্যায়াম করছে।

একটু পর হাসিমুখে ঢুকল পিতু, সারাগায়ে ঘাম ঝরছে। আমাকে বলল, "অ্যাই সুমে বাইরে গেটের দিকে তাকিন দ্যাখ। ওই লোকটা, মানে অজ্জুন সিংহ কেমন ঘুম মারছে। ব্যাটা কুম্ভকন্যের লাতি।" রাজবাড়িতে পুলিশগার্ড বসানো হয়েছে গত কাল থেকে। তাকিয়ে দেখি, গার্ডদের মধ্যে একজন মেহগনি গাছের নীচে লনে শুয়ে আছে চিত হয়ে। বলাইবাহুল্য যে, দিবানিদ্রা যাচ্ছে। এত দূর থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে পরনে কনস্টেবলের পোশাক। অর্জুন সিংহ ছাড়া কেউ নয়। আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম।

মানুদা ফিরল দেড়টার সময়। কাকাবাবু তার কিছুক্ষণ পর ফিরলেন। মানুদা আসার পর আমরা একসঙ্গে খেয়ে নিলাম। কাকাবাবু খাবার টেবিলে মানুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সিউড়িতে কোথায় গিয়েছিলে?"

মানুদা জবাব দিল, "আমার চেনা এক ফিজিক্সের প্রোফেসর অবসর নেওয়ার পর সিউড়িতে রয়েছেন। প্রোফেসর অমর সান্যাল। আমাকে তিনি ভীষণ স্নেহ করেন। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

কাকাবাবু শ্রদ্ধাঘন চোখে মানুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তিনি এখন সিউড়িতে আছেন জানতাম না তো। দিকপাল মানুষ। দেশে-বিদেশে তাঁর খ্যাতি আছে। আমাকে ঠিকানা দিও। একবার আমিও দেখা করতে যাব তাঁর সঙ্গে।"

খাওয়াদাওয়ার পর আমাদের সপ্তর্ষি মণ্ডলের সভা বসল। অতিথি হিসেবে রাণি। সভাপতি সব সময়েই মানুদা। বড় এক ফ্লাস্ক চা রয়েছে। আছে বিস্কুট। দরজা বন্ধ।

মানুদা বলল, "হঠাৎ এভাবে মহাকালী দর্শন দিলেন কেন? আর দিলেন একেবারে রুদ্র মূর্তিতে? যেন তিনি বলতে চান যে, ওই বাগানবাড়িতে কেউ থাকে তা তাঁর মনঃপূত নয়। ভেবে দ্যাখ, সন্দীপ শেঠিরও বড় লোভ এই বাগানবাড়িটার প্রতি। মনে হয় ছলে-বলে-কৌশলে সে এই জায়গাটা হাত করতে চায়।"

বাঘা ফাটা রেকর্ড চালাল, "কি-কিন্তু—মা-কা-কালী—কোথা—থেকে এল?"

নেরু বলল, "তিনি কি শেঠির দলে ভিইড়্যা গিয়া মর্তে নাইম্যা জনগণেরে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করছেন?"

রানি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "বাবা তাঁকে এত ভক্তি করেন, পূজা করেন। তবে মা কালী এমন কেন করল? আমি মন্দিরে গিয়ে মা-কালীকে খুব বকব। কেন তিনি আমাদের অমঙ্গল চাইছেন?"

মানুদা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে এই মা-কালীর আবির্ভাব হলোগ্রাম প্রোজেকশন নয়তো? আমাদের দেশে হলোগ্রাফি বিরল। তবে শেঠির পক্ষে সব সম্ভব। এই হলোগ্রাফিক ইমেজ সম্পূর্ণভাবে ত্রিমাত্রিক। তবে একটা কথা, এটা চালাতে গেলে প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়। তা ছাড়াও বড়-বড় মেশিনের দরকার হয়। ওই বাগানবাড়ির দু'কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনও বসতি নেই। হলোগ্রাফিক প্রোজেকশন করলে কোথা থেকে করল? আমি জায়গাটা তন্নতন্ন করে দেখেছি। কোনও চিহ্ন পাইনি। তবে কী বিশ্বাস করে নিতে হবে যে, স্বয়ং মা-কালী এসে সবাইকে ভয়ে তটস্থ করে শাসিয়ে গেলেন ওই বাগানবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য?"

ভুতো এতক্ষণ চুপ করে কথা শুনছিল। এবার সে মুখ খুলল, "হলোগ্রাফিক প্রোজেকশন লেসার বিমের সাহায্যে করা হয়। লেসার বিমের সঙ্গে শব্দ-তরঙ্গও প্রতিক্ষেপ করা যায়। তবে এই টেকনোলজি আমাদের দেশে এখনও সেভাবে প্রসারলাভ করেনি। তবে আসল কথা ওই বিশেষ জায়গাটি কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ভীষণ দামি। না হলে সন্দীপ শেঠি মুম্বই থেকে অত খরচ করে এখানে আসবেই বা কেন? আর ওরকম অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকার টোপই বা দেবে কেন?"

মানুদা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস। চল নীচে। ওখানে অত পুরনো আমলের লোক এসেছেন। ওঁদের জিজ্ঞেস করলে অনেক কিছু জানা যাবে।"

নীচে এলাম আমরা। গজেশ সামন্ত কোথায় যেন গেছেন। বাকি সবাই আছেন। আমরা কার্পেটের উপর বসলাম। আয়েঙ্গারজি, যশোদাবাঈ ও মাখনবাবু সোফার উপর বসে আছেন। হলধর ও বলরামদাদু আমাদের মতো কার্পেটের উপরে বসলেন। মনসা দাসী একটা টুলের উপর বসে।

মানুদা হলধরকে বলল, "আচ্ছা হলধরদাদু, আপনি তো বহু দিনের পুরনো লোক। আমাদের ওই বাগানবাড়ির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যা জানেন বলুন। আমরা ভীষণ কৌতূহলী হয়ে পড়েছি।"

হলধর মুখ খুললেন, "আমার প্রায় নব্বই বছর বয়স হতে চলল। আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ওই বাগানবাড়ি দেখছি। আমরা ছেলেবেলায় ওখানে খেলা করতাম। দাদুর মুখে শুনেছি বহু আগে ওখানে নাকি শ্মশান ছিল। শ্মশানের মড়া পোড়ানোর কাঠের অঙ্গার লেগে জায়গাটার মাটি কালচে হয়ে গেছে। তাই এখানে প্রচুর ফসল ফলে। সার দেওয়ার দরকার হয় না।"

"ব্রিটিশদের ভারতে আসার আগে থেকেই এঁরা এখানকার রাজা ছিলেন। সূর্যকান্তের অতি বুড়ো পূর্বপুরুষ হেমদাকান্ত... না বোধ হয়। হেমদাকান্তের ছেলে করুণাকান্তের আমলে এই জায়গা ঘিরে নিয়ে পাঁচিল দেওয়া হয়। শ্মশানের জায়গা বলে অনেকে আপত্তি করেছিল। রাজাসাহেব করুণাকান্ত গ্রামের বাইরে এক বিশাল জায়গা দেবোত্তর করে দেন শ্মশান হিসেবে। এখনও সেই জায়গাটাই শ্মশান হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।"

এবার শুরু করলেন বলরাম সূত্রধর, "আমার দাদুর বাবা একশো বছরেরও বেশি বেঁচে ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে শুনেছি, ওই শ্মাশানের মধ্যে শ্মাশানকালীর এক বেদি ছিল। তার সামনে মুখাগ্নি করা হত। করুণাকান্তের পুত্র যমুনাকান্তের আমলে এক বিশাল দিঘি কাটা হয় সারা বছর জল পাওয়ার জন্য।



শ্মাশানকালীর বেদিটা ছিল ঠিক দিঘির মধ্যিখানে। ওই জায়গাটায় মাটি কাটা হয়নি। তাঁর ছেলে বরদাকান্ত দিঘিটা পুনরায় সংস্কার করেন। তিনিই এই বাংলোবাড়ি তৈরি করান এবং ওই জলের মাঝখানে মন্দির নির্মাণ করান। হলধরদার বাবা ছিলেন প্রধান রাজমিস্ত্রি। আর সাধনের বাবা লোহার সমস্ত কাজ করেছিলেন। আমার বাবা যাবতীয় কাঠের কাজ করেছিলেন।"

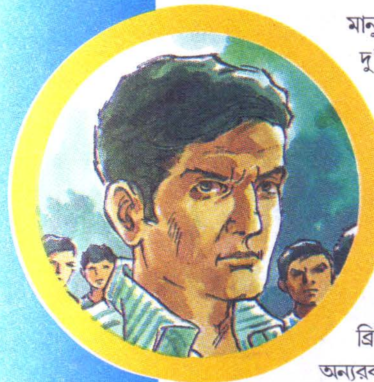
মানুদা এবার নায়েবমশাই মাখনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা নায়েবদাদু, এই বাগানবাড়ির মধ্যে কোনও গুপ্তধনটন নেই তো?"

তিনি বাঁধানো দাঁত বের করে হেসে বললেন, "আরে না। ওসব গল্প-উপন্যাসে থাকে। পুরনো রাজবাড়ি বা বাগানবাড়ি, তার মধ্যে গুপ্তধন হাঃহাঃ। সূর্যকান্তের প্রপিতামহ বরদাকান্তকে আমি দেখেছি। তখন খুব ছোট ছিলাম। আমাকে তিনি খুব ভালবাসতেন। শেষের দিকে বেশিরভাগ সময় তিনি বিছানাতেই শুয়ে কাটাতেন। সূর্যকান্তের বাবা অমলাকান্ত বয়সে বড় হলেও, আমাদের মধ্যে বন্ধুর সম্পর্ক ছিল। বরদাকান্ত ছিলেন এই পরিবারের সবচেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বিদেশেও গিয়েছলেন অনেকবার। তিনি আমাকে যা বলেন তা অসাধারণ ব্যাপার। ওই বাগানবাড়ির মাটি মনে হয় পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছিল। ঠিক যেন এক আড়াই একর গরম লাভার স্তূপ ওই জায়গায় কোথা থেকে এসে পড়ে। জায়গাটার উপরিভাগে বেশ কয়েকটা জায়গায় ক্রেটার অর্থাৎ বড়-বড় গর্ত ছিল। বরদাকান্ত বলেন, গলিত লোহা ঢালার পর যখন ঠান্ডা হয় তখন শক্ত লোহার পিণ্ডের গায়ে এই ধরনের গর্ত দেখা যায়। আমাকে তিনি বলেন যে, বোধ হয় কোনও বিশাল উল্কাখণ্ড এক অজানা সময়ে এই জায়গায় পড়েছিল। তা কোটি বছরও হতে পারে। যে দিঘি তিনি কাটিয়েছিলেন তা এক কৌতূহল নিয়েই তিনি করেছিলেন। প্রায় পঁচিশ ফুট মাটি খোঁড়া হয়েছিল পুকুরের মাঝামাঝি অংশে। কালচে ছাই-রঙের মাটি বেরিয়েছিল। অথচ এ অঞ্চলের সব জায়গার মাটির রং লালচে। বহু যুগ আগে হয়তো এই উল্কা পড়েছিল, তাই তার আইডেন্টিটি-মার্ক আর বজায় নেই। তবে এই জায়গার মাটি অত্যন্ত উর্বর।" সেই কথা শুনে মানুদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "ধন্যবাদ নায়েবদাদু। আপনার কথা আর আমার সন্দেহ হুবহু মিলে গেছে। বরদাকান্তবাবু সত্যিই অসাধারণ জ্ঞানীব্যক্তি ছিলেন।"

করঞ্জাক্ষ ভট্টাচার্য

বিকেলবেলা দলবেঁধে আমরা করঞ্জাক্ষবাবুর বাড়ির সামনের মাঠটায় গেলাম। সঙ্গে কুলদীপ ও বাসুদেও। সেখানে এলাহি ব্যাপার চলছে। নব্বই ইঞ্চি বিরাট স্ক্রিনে ভিডিও দেখানো হচ্ছে। তার পাশে দু'টো তাঁবু। একটায় চলছে ম্যাজিক-শো, অন্যটায় সার্কাস। ছেলে-বুড়ো সব ভেঙে পড়েছে সেখানে। দু'টাকার টিকিট পাঁচ টাকায় ব্ল্যাক হচ্ছে।

কাছে গিয়ে দেখলাম দু'টো ওয়াগন-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, যা আমাদের পূর্বপরিচিত। তার কাছে লেগে আছে একটা মিনিবাস। পিতু উঁকি মেরে বলল, "এই গাড়ির লোকগুলান রাস্তায় ঝামেলা কর‍্যাছিল। ইয়ার ভিতরে দমদম করি আওয়াজ হচ্ছে ক্যানি?"



মানুদা বলল, "বড়-বড় জেনারেটর আছে ভ্যান দু'টোর মধ্যে। একটা চলছে, অন্যটা স্ট্যান্ডবাই আছে। এটা গরম হয়ে গেলে ওটাকে চালাবে। সাইজ দেখে মনে হচ্ছে এক-একটা জেনারেটর অন্তত বিশ কিলোওয়াটের হবে।"

ভিডিওর তাঁবুর দিকে এগোতেই সেই কাঁচাপাকা দাড়ির বিশালদেহী আমাদের দিকে এগিয়ে এল। যার সঙ্গে আমাদের সেই ব্রিজের কাছে টক্কর হয়েছিল। আজ তার মুড অন্যরকম। সামনে এসে আগের দিনের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল মানুদার কাছে। সে আমাদের ঠিক চিনে নিয়েছিল। পরিষ্কার ইংরেজিতে যা বলল, তার বাংলা করলে হয়, "আরে বাবুমশাই, আপনি। দেখুন তো, ঠিক চিনেছি কি না? সেদিন আপনার সঙ্গে একটু অভদ্রতা করে ফেলেছিলাম। আমরা যাযাবর মানুষ, এখানে-ওখানে ঘুরি, পেটের ধান্দায়। রাস্তাঘাটে কখনও-সখনও মাথা খারাপ হয়ে যায়। দয়া করে ক্ষমা করবেন। আসুন স্যার, কী দেখবেন? ম্যাজিক, সার্কাস, না ভিডিও-শো। সব টিকিট শেষ হয়ে গেছে। তবে আপনাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দেব।"

মানুদা মৃদু হেসে বলল, "আজ না, অন্য একদিন দেখব। এখানে এত বড় সব কর্মকাণ্ড চলছে, তাই একবার দেখতে এলাম।"

বিশালদেহী বলল, "আমরা এখনও দশ দিন এখানে থাকছি। আপনাদের যেদিন ইচ্ছে হবে, চলে আসবেন।"

মানুদা বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এগোতে লাগল। সঙ্গে আমরাও চললাম। একটু এগিয়েই মানুদা বলল, "কী বিশাল জেনারেটর দু'টো। মাঠটা করঞ্জাক্ষবাবুর। একবার ওঁর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।"

করঞ্জাক্ষবাবু অকৃতদার। তাঁর বাড়িটা বিশাল। নীচে একটা অতি বিশাল হলঘর রয়েছে। তারপরে এক মাঝারি ঘর। দু'টোর মাঝখান দিয়ে উপরে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। সারা বাড়ি সাত ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে লোহার গেট। ধারেকাছে কেউ নেই। গেট থেকে ভিতরে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা আছে, যা দু'ভাগে ভাগ হয়ে একটা বাড়ির দরজার দিকে, অন্যটা গ্যারাজ ঘরের দিকে গেছে। সিমেন্টের রাস্তার অদূরে একটা ছোট বাগান আছে । সেই বাগান ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নীল রঙের একটা মারুতি-আটশো গাড়ি।

গেটের ল্যাচটা টানতেই খুলে গেল। আমরা মানুদার পিছন-পিছন ঢুকলাম। মোটা লোহার দরজার পাশে ডোরবেল আছে। তখন বিদ্যুৎ ছিল। মানুদা বেল টিপল দু'বার। তারপর প্রায় সেকেন্ড চল্লিশেক সময় কাটার পর ঘটাং করে দরজা খুলল। এক গাট্টাগোট্টা ভৃত্য দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডান দিকের ভুরুর উপরে একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। আমাদের দেখে সচকিতভাবে চাপা গলায় বলল, "সিধা যাকে ডাইনা মোড় লে লিজিয়ে। বড়াঘর মিলেগা। সাহাব বঁহা হ্যায়।"

আমরা ঢুকে কিছুটা এগোতেই দেখলাম ডান দিকে এক বিশাল দরজা। তার পাশে দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে। মনে হল, কে একজন আমাদের দেখে চট করে সিঁড়ির পাশ দিয়ে সরে গেল, আমরা কিছু বোঝার আগেই।

বিরাট হলঘর। চল্লিশ বাই তিরিশ ফুট হবে। মাঝামাঝি জায়গার দেওয়ালে একটা ফায়ারপ্লেস। তার উপরে এক ভালুকের চামড়াসর্বস্ব দেহ টাঙানো। এখানে গরমকালে যেমন গরম, শীতকালে তেমনই শীত। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বাঘ, সিংহ, চিতা, হায়েনা প্রভৃতি প্রাণীর স্টাফ করা দেহ দাঁড় করানো আছে। মেঝেটা লাল-নীল মোটা পাথরে মোজাইক করা। অনেক সোফা ছড়িয়ে আছে মেঝের উপর। ফায়ার প্লেসের দিকে পিছন করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন শিকারি করঞ্জাক্ষ ভট্টাচার্য। পাশের সোফায় নগেন হালদার, প্রাণগোপাল রক্ষিত ও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে বসে রয়েছেন গজেশ সামন্ত।

করঞ্জাক্ষবাবু চোখ বিস্ফরিত করে বললেন, "তোমরা আমার এখানে আসবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। এসেছ যখন তখন কী খাবে বলো? চা না কফি?"

মানুদা শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "আপনার মাঠে ম্যাজিক-সার্কাসের শো হচ্ছে। তা ছাড়া ভিডিও-শো চলছে। রানির কথায় এদিকে এলাম। আর এলাম যখন, তখন ভাবলাম যে, আপনার মতো একজন বড় শিকারির বাসগৃহটা দেখে যাব। কিছু মনে করবেন না, আমরা কিছু খাব না। আর আপনারা দেখছি ব্যস্ত আছেন, আমরা তবে আসি।"

করঞ্জাক্ষবাবু বললেন, "আরে না, না। এই প্রথমবার তোমরা এলে, এত সহজে কী যেতে দিতে পারি।"

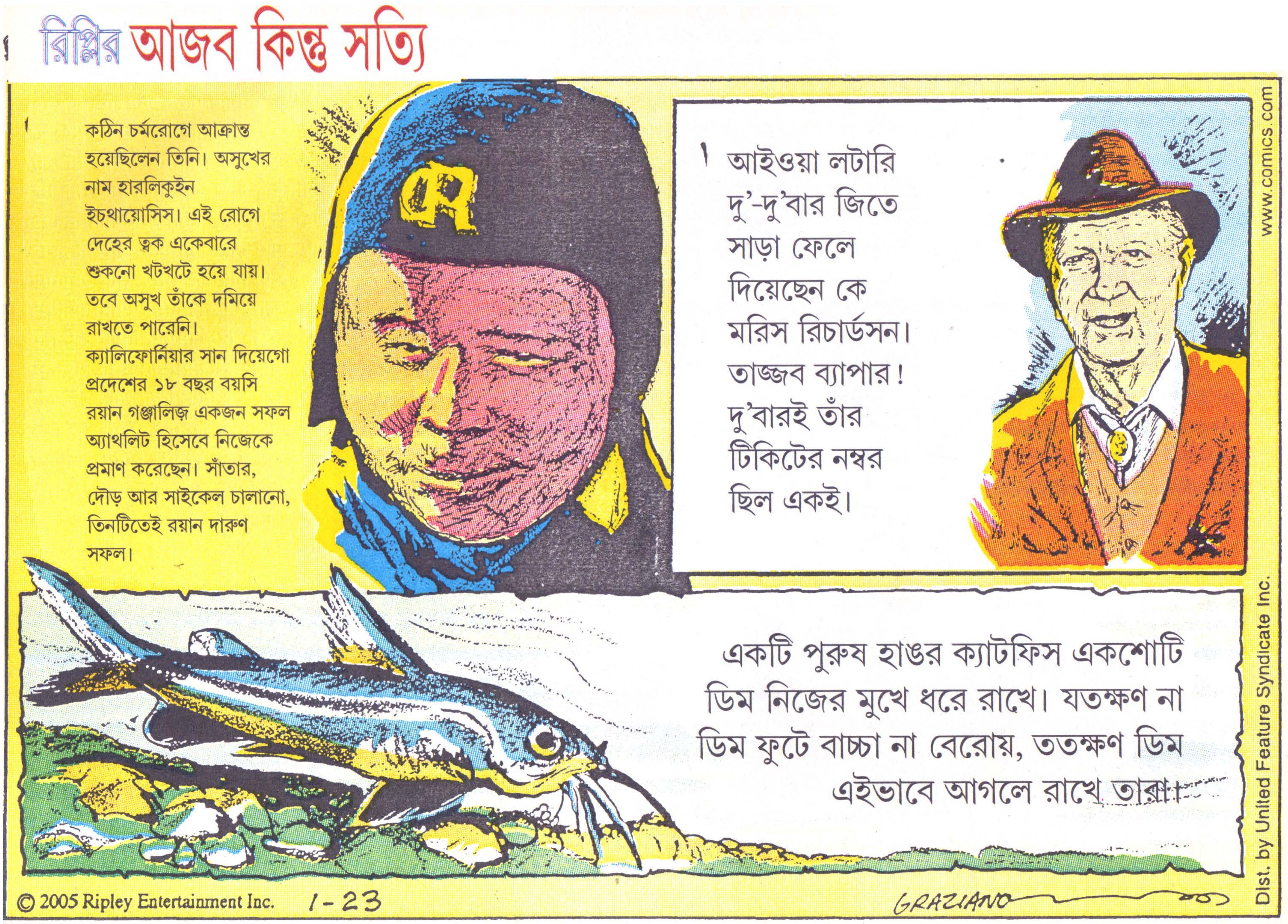
আমরা একরকম বাধ্য হয়েই সোফার উপর বসলাম। বাসুদেও আর কুলদীপ দু'টো টুলের উপর বসল। করঞ্জাক্ষবাবু বললেন, "এখানে যেসব জানোয়ারের স্টাফড্ বডি দেখতে পাচ্ছ, সব আমার শিকার। ওই যে ম্যানইটার বাঘটার দেহ দেখছ, ওটাকে আমি মারি কুমায়ুনে। বারোটা মানুষ মেরেছিল হতভাগাটা। ওই সিংহ দু'টো খাস আফ্রিকার। উগান্ডার জঙ্গলে ওদের আমি শিকার করি। ওখানকার মাসাই আদিবাসীরা আমাকে ভীষণ সাহায্য করে। তারপর অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ওদের দেহ ভারতে নিয়ে আসি।"

"আমি প্রথম কলকাতাতেই ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। কিন্তু বাল্যবন্ধু সূর্যকান্ত ও প্রাণগোপালের অনুরোধে এখানে এসে বাড়ি করেছি। এই জায়গা সূর্যকান্তেরই ছিল। ওই মাঠ ও এই বাড়ির জায়গা সে আমাকে দিয়েছে একেবারে জলের দরে। বন্ধু বলে যেটুকু না নিলে নয়, তাই নিয়ে। এ-গ্রামে খেলাধুলোর চর্চা ছিল না। তাঁর অনুরোধে আমি এই মাঠে ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চা, ফুটবল, বাস্কেটবল, অ্যাথলেটিক্স প্রভৃতি বিষয়ে ট্রেনিং দিই। এক সময় আমি কৃতী ক্রীড়াবিদ ছিলাম। উপরে গেলে অনেক কাপ-মেডেল দেখতে পাবে।"

ভুতো বলল, "আসার সময় তো দেখলাম মাঠটায় ভিডিও-শো, ম্যাজিক-শো আরও কত কী চলছে।"

করঞ্জাক্ষবাবু বললেন, "ওহো। ওরা বনজারা। আগে মাদারির খেলা দেখাত। এখন ওদের উন্নতি হয়েছে। ওদের নেতা মতিলাল। দেখেছ বোধ হয়, বিরাট শরীর, দাড়ি আছে। সে এসে হাতে-পায়ে ধরল, তাই মাঠটা ক'দিন ওদের ছেড়ে দিয়েছি। গ্রামবাসীরা কিছুই দেখতে পায় না। তারাও যাই হোক অনেক আনন্দ পাচ্ছে। মতিলালদেরও কিছু পয়সা হচ্ছে।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)


রিপ্লির আজব কিন্তু সত্যি
কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। অসুখের নাম হারলিকুইন ইচ্‌থায়োসিস। এই রোগে দেহের ত্বক একেবারে শুকনো খটখটে হয়ে যায়। তবে অসুখ তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগো প্রদেশের ১৮ বছর বয়সি রয়ান গঞ্জালিজ় একজন সফল অ্যাথলিট হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। সাঁতার, দৌড় আর সাইকেল চালানো, তিনটিতেই রয়ান দারুণ সফল।
আইওয়া লটারি দু'-দু'বার জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন কে মরিস রিচার্ডসন। তাজ্জব ব্যাপার! দু'বারই তাঁর টিকিটের নম্বর ছিল একই।
একটি পুরুষ হাঙর ক্যাটফিস একশোটি ডিম নিজের মুখে ধরে রাখে। যতক্ষণ না ডিম ফুটে বাচ্চা না বেরোয়, ততক্ষণ ডিম এইভাবে আগলে রাখে তারা।
© 2005 Ripley Entertainment Inc.
1-23
GRAZIANO
Dist. by United Feature Syndicate Inc.
www.comics.com



প্রতিটি শহর গড়ে ওঠার পিছনেই রয়েছে কত ইতিহাস! আমাদের 'সিটি অফ জয়'-ই হোক বা 'বিগ অ্যাপ্‌ল', রোমাঞ্চে ভরা এই সব শহর এবার আমাদের কুইজের বিষয়।

কুইজ়

১ সিরাজদ্দৌল্লা ভারতবর্ষের কোন শহরের নাম দিয়েছিলেন 'আলিনগর'?

২ পর্তুগিজ় ভাষায় কোন শহরের নামের অর্থ 'জানুয়ারির নদী' বা 'রিভার্স অফ জানুয়ারি'?

৩ ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত এই শহরটি 'এডো' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে শহরটির নামের অর্থ 'প্রাচ্যের রাজধানী' বা 'ক্যাপিটাল অফ দ্য ইস্ট'। কোন শহর?

৪ কোন শহরকে বলা হয় 'আলোর শহর' বা 'সিটি অফ লাইট্‌স'?

৫ এই শহরে আছে প্রায় ১৫০টি খাল এবং ৪০০-র বেশি ব্রিজ। 'অ্যাড্রিয়াটিকের রানি' নামে ডাকা হয় শহরটিকে। কোন শহর? এর বেশি পরিচিত নামটি কী?

৬ বার্লিন শহরকে আলাদা করে দেওয়া বিখ্যাত প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়েছিল কোন সালে?

৭ আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম শহরের নাম কী?

৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহর 'বিগ অ্যাপ্‌ল' নামে পরিচিত?

অভিজিৎ সুকুল, তনুশঙ্কর চক্রবর্তী



গত সংখ্যার উত্তর

১. অ্যারিস্টটল।
২. মারিয়া মন্তেসরি।
৩. হেলেন কেলার।
৪. টম ব্রাউন্‌স স্কুল ডেজ়।
৫. হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজ়িও।
৬. হামফ্রে ডেভি।
৭. 'আর্চি' কমিক্‌সে রিভারডেল হাই স্কুল।
৮. স্কুলি।

জবাব চাই

১. কোন দুই শহরকে নিয়ে লেখা হয়েছিল 'আ টেল অফ টু সিটিজ়'?
২. কোন শহর সম্পর্কে বলা হয়, '... ওয়াজ় নট বিল্ট ইন আ ডে'?
৩. উরুগুয়ের রাজধানী কোন শহর?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. ড: সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ। ২. দ্রোণাচার্য। ৩. সচিন তেন্ডুলকর।

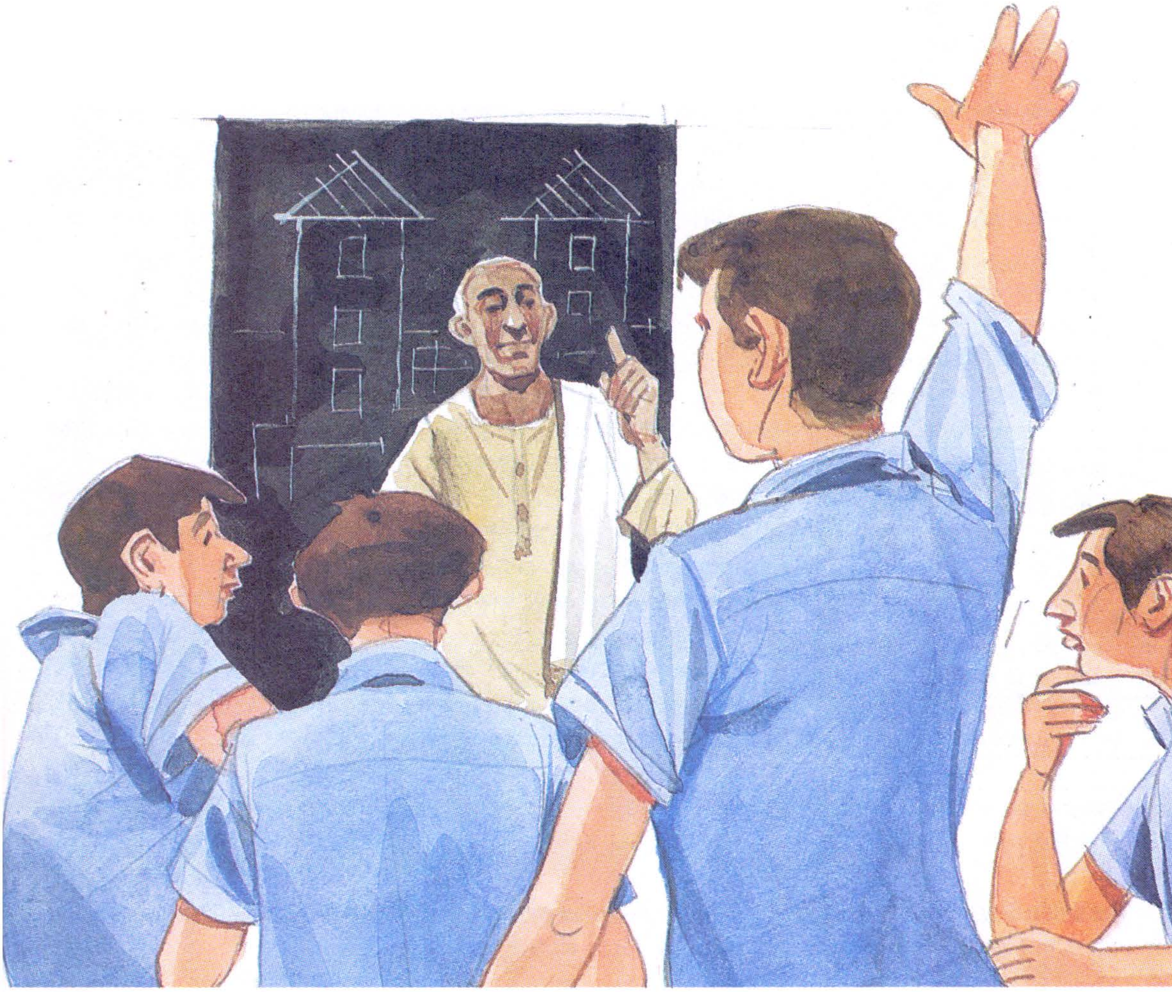
সঠিক উত্তরদাতা

নম্রতা দাস, ষষ্ঠ শ্রেণি, দেবীশ্বরী বিদ্যায়তন, উত্তরপাড়া; **সুতনু বন্দ্যোপাধ্যায়**, অষ্টম শ্রেণি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা; **চৈতালি রায়**, অষ্টম শ্রেণি, নিউ ব্যারাকপুর কলোনি গার্লস হাই স্কুল; **ঐশ্বর্যপ্রজ্ঞা**, অষ্টম শ্রেণি, ডি এ ভি মডেল স্কুল, আই আই টি, খড়্গপুর; **সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়**, সপ্তম শ্রেণি, মেথডিস্ট স্কুল, ডানকুনি; **কিঞ্জল মজুমদার**, পঞ্চম শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, দুর্গাপুর; **দীপ্তাংশুকুমার পাল**, নবম শ্রেণি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা; **সোমনাথ ঠাকুর**, ষষ্ঠ শ্রেণি, হোলি হোম, কলকাতা; **সম্পূর্ণা রায়**, দ্বাদশ শ্রেণি, কালীকৃষ্ণ গার্লস হাই স্কুল, বারাসাত; **সর্বজিৎ রায়**, ষষ্ঠ শ্রেণি, মহাত্মা গাঁধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল, বারাসাত; **শুভদীপ সেনগুপ্ত**, দশম শ্রেণি, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল; **সুনীত দাস**, অষ্টম শ্রেণি, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়, রিষড়া; **মেঘমা ঘোষ**, পঞ্চম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ্‌স কনভেন্ট, চন্দননগর; **সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়**, নবম শ্রেণি, ডন বসকো স্কুল; **অপরূপ আইচ**, রিষড়া বাণীভারতী, রিষড়া; **শমী বিশ্বাস**, দ্বাদশ শ্রেণি, চাকদহ বসন্তকুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠ, নদিয়া; **সুদীপ দে**, হাওড়া জিলা স্কুল; **শময়িতা ও সৃজিতা সরকার**, কোন্নগর, হুগলি; **রক্তিমাভ বসু**, ষষ্ঠ শ্রেণি, নব নালন্দা হাই স্কুল, কলকাতা; **বিদিশা বসু**, অষ্টম শ্রেণি, রিষড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি; **পৌলিতা সিংহ**, অষ্টম শ্রেণি, তাম্রলিপ্ত বালিকা বিদ্যাপীঠ, তমলুক; **সায়ন্তী দাস**, অষ্টম শ্রেণি, হুগলি গার্লস হাই স্কুল; **প্রদীপ**



দত্ত, দশম শ্রেণি, হুগলি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ; **অনুরাধা ঘোষ**, অষ্টম শ্রেণি, বর্ধমান বিদ্যাভারতী ভবন গার্লস হাই স্কুল; **বরুণকুমার বিশ্বাস**, দশম শ্রেণি, দুর্গাপুর বিদ্যানিকেতন; **রাজসী সামন্ত**, দশম শ্রেণি, বাগনান আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়; **দেবমিতা ভট্টাচার্য**, অষ্টম শ্রেণি, কোন্নগর হিন্দু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; **চৈতালি সরকার**, দশম শ্রেণি, চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়; **আবৃত্তি গুহ**, পঞ্চম শ্রেণি, মেমারি রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়, বর্ধমান; **অনুপম পাল**, ষষ্ঠ শ্রেণি, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল; **মনোতপা ভৌমিক**, ব্রাইটল্যান্ড্‌স, দেরাদুন; **সায়ক চট্টোপাধ্যায়**, ষষ্ঠ শ্রেণি, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন; **অভিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়**, অষ্টম শ্রেণি, বারাসাত প্যারীচরণ সরকার রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল:
anandamela@abpmail.com





তাতুর শব্দজব্দ

বিকাশ বসু

তাতুকে নিয়ে বেশ মুশকিলেই পড়া গেছে। এত অল্প বয়সে এরকম উদ্ভাবনী শক্তি বোধ হয় ভাল নয়। অন্তত বাড়ির লোকজনদের পক্ষে ভাল তো নয়ই।

এই তো সেদিন, হঠাৎ সে বলে বসল, "পিসেমশাইকে একদিন খেয়ে ফেলব।"

আমরা বললুম, "এ কী কথা! পিসেমশাইয়ের যদি কানে যায়! ছি, ছি!"

বাড়ির মধ্যে তাতুর সেজকাকা ধৈর্যশীল মানুষ। তিনি বললেন, "কেন রে, পিসেমশাই কি তোকে মেরেছেন-টেরেছেন না কি?"

তাতু বলে উঠল, "এই তো সকালেই পাকা চুল তুলে দেওয়ার জন্য একটা সিকি দিলেন।"

আমরা বললাম, "তবে?"

তাতু বলল, "পিসেমশাইয়ের নাম প্রসাদ কেন?"

আমি লক্ষ করেছি, ক্লাস ফাইভে ওঠার পর থেকেই তাতুর এই শব্দরোগ শুরু হয়েছে। আর, ওদের নতুন স্যারের পৃষ্ঠপোষকতায় তা দিনদিন বেড়েই চলেছে। নতুন স্যার শিশিরবাবু একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ। অদ্ভুত সব কাজ করেন। একদিন করলেন কী, অঙ্কের ক্লাসে একটা বাড়ির ছবি আঁকলেন। ছবি, মানে আউটলাইন। তবে, আউটলাইন হলেও দেখে বোঝা যায় ওটা বাড়িই।

ছাত্ররা তো হতবাক। অঙ্কের ক্লাসেই ড্রয়িংক্লাস শুরু হল নাকি?

নতুন স্যার সেই বাড়িটার দু'টো দেওয়ালের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় এরকমভাবে লিখলেন—

প্রশ্নমালা ২১

অঙ্ক ১৭, ১৮, ১৯, ২০

কয়েকটি ছেলে তৎক্ষণাৎ বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শোরগোল তুলল, "কিছু বোঝা গেল না স্যার। কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না স্যার।"

তাতু লাফিয়ে উঠে বলল, "ও বুঝেছি। এগুলো বাড়ির অঙ্ক, মানে হোমটাস্ক। তাই না স্যার?"

নতুন স্যার বললেন, "রাইট।"

পড়াশোনার পর হাতে সময় থাকলে নতুন স্যার কথা নিয়ে খেলা করেন। কোনওদিন হয়তো বললেন, "বলো দেখি, কোন দস্যু ঘরে থাকে?"

কেউ বলতে পারল না। তিনি নিজেই বলে দিলেন, "মগ, জলের মগ। ইংরেজি উচ্চারণ অবশ্য 'মাগ'। আমরা বাংলায় *বলি মগ। আর, এই দস্যুকেই তো ঘরে* স্থান দিয়েছি।"

এর পর মগ দস্যুদের গল্প শুরু হয়ে যায়। তা থেকে চাঁদ রায়, কেদার রায়ের বীরত্ব। সেখান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

তাতু একদিন নিজেই এই ধরনের শব্দজব্দ তৈরি করে নতুন স্যারের দিকে ছুড়ে দিল, "স্যার বলুন তো, কোন কাকা জলে ভর্তি?"

নতুন স্যার তো অনেক আকাশপাতাল ভেবেও জলভর্তি কোনও কাকার সন্ধান করতে পারলেন না। তখন তাতু বলে দিল, "টিটিকাকা।"

টিটিকাকা একটা হ্রদের নাম। আজই সকালে তাতুর দাদা সতু দক্ষিণ আমেরিকার ভৌগৌলিক বিবরণ মুখস্ত করছিল। সেখান থেকেই তাতু এই নামটা জানতে পেরেছে।

নতুন স্যার শুধু বললেন, "চমৎকার! চমৎকার হয়েছে!"

নতুন স্যার তো তাতুকে মস্ত এক সার্টিফিকেট দিয়ে বসলেন, এদিকে আমাদের যে প্রাণ যায়!

তাতু প্রায়ই তার ছোটকাকে, মানে আমাকে বিপদে ফ্যালে। আমি তার কাকা, বয়সে বড়। সুতরাং আমাকে প্রশ্ন করার হক আছে তাতুর। আমারও সঠিক উত্তর দেওয়ার কথা। আর সেখানেই হয়েছে বিপদ।

এই তো সেদিন তাতু প্রশ্ন ছুড়ে দিল, "বলো তো ছোটকা, কোন জায়গা একটা ফুলের মতো?"

আমি বলি, "তার মানে বলতে চাস, সেখানে একটি মাত্র ফুল ফোটে? তা কি সম্ভব?"

তাতু বলল, "ধ্যাত, তা কেন, ভাল করে শোনো প্রশ্নটা। কোন জায়গা একটা ফুলের মতো?"

"মানে, বলতে চাস জায়গাটা নিজেই একটা ফুলের মতো?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"সে কী করে হয়?"

"সেখানে তুমি গিয়েছ অনেকবার, ছোটকা।"

"গিয়েছি?" আমি আকাশপাতাল ভাবি। ভেবে বলি, "আমি যেসব জায়গায় গিয়েছি, সেখানে ফুল ফোটে। একটা নয়, অনেক। কিন্তু জায়গাটা নিজেই..."

"হ্যাঁ, জায়গাটা নিজেই একটা ফুলের মতো," তাতু জোরের সঙ্গে বলল, "সেটা কী ফুল তুমি জানো ছোটকা, মনে করতে পারছ না।"

"কী ধন্দে ফেলিলে বৎস!" আমি হাসবার চেষ্টা করি।

তাতু বলল, "উঁহু, হাসলে চলবে না। চেষ্টা করো। তোমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ি সেখানে।"

আমার আত্মীয়র সংখ্যা তো কম নয়। কার কথা ভাবব? বললুম, "ধ্যাত, এ আমার দ্বারা হবে না।"

"পারলে না তো?" তাতু হেসে উঠল, "একডালিয়া। ডালিয়া ফুল, তার সঙ্গে এক যোগ করলে কী হয়? একডালিয়া নয়? একডালিয়া রোডে ছোটপিসির বাড়ি নয়?"

আমি মনে-মনে বললুম, 'চমৎকার।'

তাতুর চিন্তাগুলো হিজিবিজি টাইপের। কিন্তু ও যে মাথা খেলাতে পারে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। আর, ওর এই নিজস্ব ভাষাতত্ত্ব, এ থেকেও তো মজা তৈরি হয়। তার কি কোনও দাম নেই?

আমার সেজোবউদি, মানে তাতুর মা বুঝি বলেছিলেন, "তাতু, বাজার থেকে কয়েকটা কাঁচকলা কিনে আন তো।"

তাতু বাজার থেকে কয়েকটা পাকা কলা কিনে নিয়ে এল।

তাতুর মা বললেন, "কানে কম শুনিস? বললুম, কাঁচকলা আনতে। নিয়ে এলি পাকা কলা।"

খুব শান্ত গলায় তাতু বলল, "ক'টা এনেছি, আগে গুনে দ্যাখো।"

মা গুনে বললেন, "আটটা।"

তাতু বলল, "তবে? অষ্টরম্ভা মানে কী? কিচ্ছু না। কাঁচকলা মানে কী? কিচ্ছু না। তা হলে কাঁচকলা ইজ় ইকোয়াল টু অষ্টরম্ভা। তাই না?"

বলেই তাতু ছুটে পালিয়ে গেল।

আমি বললুম, "খুব হল।"

সবাই হেসে উঠল। তাতুর মা-ও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। কাঁচকলার তরকারি আজ আর তাঁর রাঁধা হবে না!

ছবি: অনুপ রায়

বিশ্ববিচিত্রা

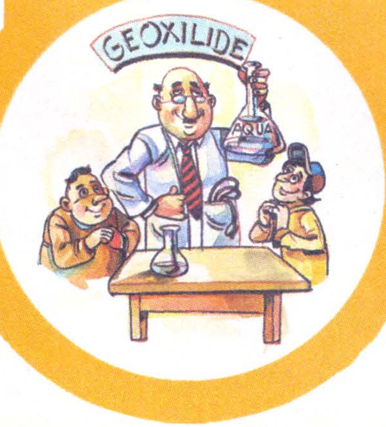


ডাইনো-কেলেঙ্কারি

প্রায় পনেরো কোটি বছর ধরে সারা পৃথিবীতে দাপাদাপি করে ডাইনোসররা হঠাৎ লোপাট হয়ে গেল কীভাবে, তা আজও রহস্য। এ-নিয়ে অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কয়েক বছর আগে দক্ষিণ ফ্রান্সে আবিষ্কৃত হয়েছে একসঙ্গে কয়েকশো ডিম, যার বেশিরভাগই নির্বীজ প্রকৃতির এবং ডাইনোসরদের দাঁত বসানো বা অর্ধেকটা খয়ে যাওয়া। তাই দেখে অনেকে বললেন যে, ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষে হঠাৎ আবহাওয়া বদলে গেল এমনভাবে যে, ডাইনোসরদের নানা শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হল। এর মধ্যে একটা হল, ডিম ফুটে বাচ্চা না হওয়া। আর, শক্তিমান ডাইনোসররা দুর্বলদের ডিম খেয়েও ফেলত। দুর্বলরাও শক্তিমানদের বাসায় গিয়ে ডিম চুরি করে পালিয়ে আসত। শেষে এমন অবস্থা হল যে, ডাইনোসরদের বংশে বাতি দেওয়ার বিশেষ আর কেউ রইল না।

আশ্চর্য ইঞ্জেকশন

১৯৩০ সাল নাগাদ আমেরিকায় একটা আশ্চর্য ওষুধ তৈরি করেছিলেন ডা: হিলিয়াম এফ কোক। তাঁর তৈরি ওই আশ্চর্য ওষুধ নাকি জ্বর থেকে শুরু করে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, হাঁপানি, বসন্ত, এমনকী ক্যানসার পর্যন্ত সারাতে পারত। ওষুধটার নাম 'গিওক্সিলাইড'। এই ওষুধের কাজ ছিল দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা। তাই একটা ওষুধেই সব রোগের উপশম। তবে এই ওষুধটা ইঞ্জেকশন হিসেবে নিতে হত। বাজারে এই ওষুধ পাওয়া যেত না, কিনতে হত ডা: কোকের কাছ থেকেই। প্রতিটি ইঞ্জেকশনের দাম পড়ত পঁচিশ ডলার। হুহু করে বিক্রি হতে লাগল ওষুধটা। কিন্তু ১৯৪৬ সালে কিছু সন্দেহবাতিক ডাক্তার গোপনে ওষুধটাকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন, তাতে জল ছাড়া আর কিছুই নেই। সঙ্গে-সঙ্গে মামলা দায়ের করা হল কোকের বিরুদ্ধে। তারপরই ওষুধ এবং ডাক্তার কোকও ভ্যানিশ।



যুক্তিবাদীদেরও সংস্কার

১৩ সংখ্যা, কালো বিড়াল আর শুক্রবার নাকি খুবই অপয়া, বিশেষ করে অনেক মার্কিনিদের কাছেই। আবার যুক্তিবাদী যাঁরা, এগুলোকে কুসংস্কার বলে বক্তৃতা দিচ্ছেন, মিছিল করছেন আর প্রচারপত্র বিলি করছেন। এঁরা কুসংস্কারবিরোধী একটা সংস্থাই তৈরি করে ফেলেছেন, নাম দিয়েছেন 'অ্যান্টি সুপারস্টিশন সোসাইটি'। অনেক দেশেই এরকম যুক্তিবাদী লোকজন আর সংস্থাও আছে। কিন্তু এই সংস্থাটির প্রতিবাদের ধরন অভিনব। মে মাসের যে ১৩ তারিখে শুক্রবার পড়ে, সেদিন এই সংস্থার বিশেষ অধিবেশন বসে। এর পরিচালন সমিতির স্থায়ী সদস্যসংখ্যা ১৩। এই সংস্থার যতজন সদস্য মারা যাবেন বা দল ছেড়ে চলে যাবেন, ততজন নতুন সদস্য নেওয়া হবে, যাতে সংখ্যাটা ১৩ থাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যখনই এই সংস্থার সভা হয়, ১৩ টা কালো বিড়াল সভাকক্ষে থাকে। যেদিন মিছিল বেরোয় সেদিনও বিড়ালগুলোকে কোলে করে নিয়ে যাওয়া হয়। সংস্থার সদস্যদের দাবি, এই নিয়ম মেনে চলার ফলে সংস্থার কোনওদিন কোনও অমঙ্গল হয়নি।



ফোটো তোলার বিপদ

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেন-এ প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান ইমাম ইয়াহিয়া-র কখনও কোনও ফোটো তোলা হয়নি। তাঁর ধারণা ছিল যে, ফোটো তোলা হলে মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। সভাসমিতিতে তাঁর ফোটো তোলা নিষেধ ছিল। ক্যামেরা নিয়ে তাঁর ধারেকাছেও কাউকে আসতে দেওয়া হত না। একবার একজন ইতালিয়ান শিল্পী তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে তাঁর মুখটা ভাল করে মনে রেখে দিয়েছিলেন, তারপর বাড়ি ফিরে স্মৃতি থেকে ছবিটা এঁকে ফেলেছিলেন। এর কিছুদিন পর একটা মার্কিন সংবাদপত্র এই খবরটা পেয়ে যায় এবং শিল্পীর কাছ থেকে চড়া দামে কিনে ছবিটা ছাপিয়ে দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার, সেদিনই ইয়েমেনে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং ইয়াহিয়া আর তাঁর তিন ছেলে নিহত হন।

চঞ্চল পাল

ছবি: **কৌশিক কুণ্ডু**

বেড়ানো

ডুয়ার্সের তিন মায়াবী অরণ্যের হাতছানি আর দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দেখা হয়ে যেতে পারে বন্য প্রাণীর সঙ্গেও। রহস্য আর রোমাঞ্চে ডুবে কাটিয়ে দেওয়া যায় কয়েকটা দিন। জানিয়েছেন অসীম চৌধুরী

মেঘলোকের এক রহস্যময় দেশে

নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ৪৩ কিলোমিটার দূরে ৩১ নং জাতীয় সড়কের ডান দিকে কোদালবস্তি বনবাংলো। নাশপাতি, লিচু, নয়ানগুড়ি, আমগাছের ছায়ায় এ যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি। চিকরাশি গাছের ডালে ময়না, টিয়া, বুলবুল, ঘুঘু। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এদের আনাগোনা। এখানে ওরা বিশ্রাম নেয়, ঝগড়াঝাঁটি করে, তারপর আবার উড়ে চলে যায়। বেশ মজা লাগে দেখতে। এই কোদালবস্তির নাম রাখা হয়েছে ১৯১০ সালে, গ্রামের মণ্ডল কোদালের নামে।


কোদালবস্তি বনবাংলো

হাতিদের অবাধ বিচরণ ডুয়ার্সের অরণ্য জুড়ে। কোদালও এর ব্যতিক্রম নয়। ফসল পাকলে ওদের বনের খাবার ভাল লাগে না। হানা দেয় শস্যক্ষেত্রে। তখন ক্যানেস্তারা বাজিয়ে, পটকা ফাটিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না গ্রামবাসীদের। রণে ভঙ্গ দেয় তখন ক্রুদ্ধ হাতির পাল। বাংলোর অলিন্দ থেকে এই দৃশ্য দেখা যায়।

ফরেস্ট গার্ডদের বললে, ওঁরা সঙ্গী হবেন জঙ্গল সাফারিতে। মাত্র দু' কিলোমিটার দূরে তোর্সা নদীর পারে দুর্গম এই ঘন অরণ্য রাগী বাইসন আর হিংস্র চিতাবাঘের স্বর্গ। তবু রোমাঞ্চকর এরকম জমাটি অ্যাডভেঞ্চারে সব সময় সতর্ক চোখ রাখেন ফরেস্ট গার্ডরা। আলোআঁধারে পথ চলা। গা ছমছম করে।


দিনের শেষে বনপথে রাভাদের ফেরার পালা

কর্কশ কণ্ঠে ডেকে চলেছে লোরেং, ঝিঁঝিপোকারই এক প্রজাতি। অগুনতি গাছ—ছাতিম, জারুল, খয়ের, গামার, টুন, নাশপাতি, শাল, সেগুন, রানিচাপ। রামগুয়া গাছে কুকরি দিয়ে আঁচড় দিলেই ফিন্‌কি দিয়ে বেরোতে থাকবে টুকটুকে লাল রস। রেঞ্জারসাহেবের অনুমতি নিয়ে সি সি লাইনের ওয়াচ টাওয়ারে উঠলেই দেখা যাবে কোদালবস্তি রেঞ্জ। সামনে আপনমনে বয়ে চলেছে তোর্সা। ওপারে জলদাপাড়া অরণ্য। এখানে মাঝে-মাঝেই চলে আসে চিতাবাঘ, বাইসন, হাতি, গন্ডার, হরিণের দল। ঘুরে বেড়ায় খোলা আকাশের নীচে। জল খায়। তারপর ফিরে যায় নিজেদের জায়গায়। রয়েছে চেনা-অচেনা নানারঙের পাখি।




রাভা মেচ মেয়েরা

মাহুতের সঙ্গে ভাব জমালে জানা যায়, হাতিকে পোষ মানানোর নানা কৌশল। হাতিকে পোষ মানাতে অনেক কসরতও করতে হয়।

বাংলোর সামনেই গির্জা। দরমার ঘর। প্রতি রবিবার এখানে প্রার্থনায় বসে মানুষ।

ধীরে-ধীরে সন্ধের আঁচল জড়িয়ে রাত্রি নামে। জোনাকির আলো মাখা চোখ জুড়নো সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য অসাধারণ। জ্যোৎস্না রাতে, যখন টুপটুপ করে ঝরে পড়ে চাঁদের আলো, তখন গাছের ছায়ার আলপনা আঁকা রাস্তায় মোহময় মনে হয় চারদিক।



কোদালবস্তি থেকে মেন্দাবাড়ি গাড়িতে ৩০ মিনিটের পথ। কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় গভীর জঙ্গলে। বুড়ি বসরা নালার কাঠের পোল পেরোলেই সেই জায়গা। ১৯২৮ সালে তৈরি বনবাংলো ভাঙাচোরা ছিল এক বছর আগেও। সবাই বলত, 'ভুতুড়ে মহল'। ওখানকার মানুষ এবং বনদপ্তরের উদ্যোগে নতুন করে তৈরি হয়েছে ওই বাংলো। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, স্থানীয় মানুষদের রোজগারের সুযোগ করে দিতে ইকো-টুরিজ়মের সার্থক রূপায়ণ এই মেন্দাবাড়ি জঙ্গল-ক্যাম্প। সম্প্রতি নতুন বিলাসবহুল বাংলোর উদ্বোধন করা হয়েছে। পর্যটকদের দেখভালের দায়িত্ব ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটির। ১৮ জন স্থানীয় তরুণকে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য। মেন্দাবাড়ি, সি সি লাইন, মান্থারাম, চিলাপাতা—চার জঙ্গলের চৌমাথায় ওয়াচ টাওয়ার। সৌরশক্তিচালিত হাই ভোল্টেজ তারে ঘেরা এই মিনার। একবার ছোঁয়া লাগলেই তড়িৎ প্রবাহে পিছু হটবে বন্য প্রাণীরা। মিনারের চূড়ায় প্রতীক্ষা করলে বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ মিলবে ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি। সন্ধেবেলা স্থানীয় লোকনৃত্য রাভাদের আনজেনি নাচও দেখে নেওয়া যেতে পারে। সঙ্গে গান, বাঁশি, দোতারা, ঢোলকের সুর। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য দোলনা, মেরি গো রাউন্ড খেলার আয়োজনের অভাব নেই।

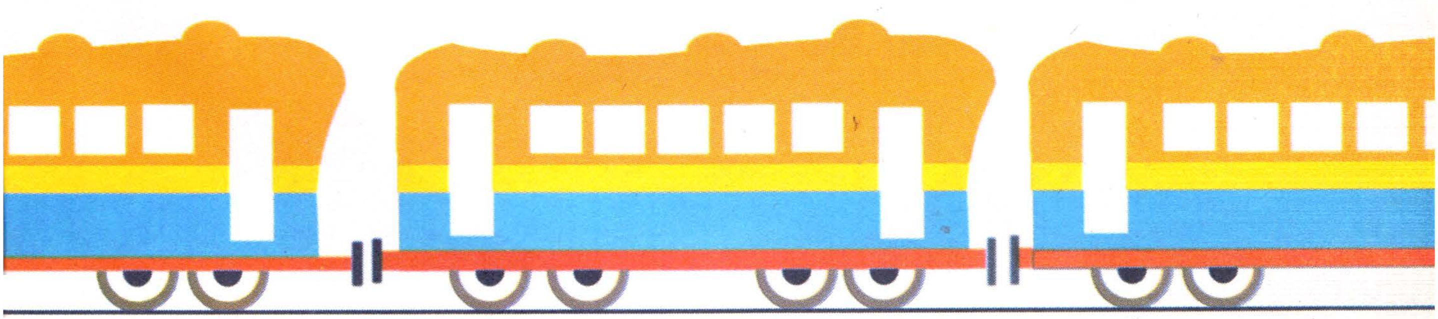

মন কাড়ে ম্যাগ্নোলিয়া ফুল

জঙ্গলমহলে সৌরবাতি রাত দশটা পর্যন্ত, তারপর সব নিঝুম, ডুবে যায় অন্ধকারে।

মেন্দাবাড়ি থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে গা ছমছমে অরণ্য চিলাপাতা। বেনিয়া নদীর ব্রিজ পেরোলেই ঘন জঙ্গল। ফরেস্ট গার্ড ছাড়া এখানে যাওয়ার অনুমতি নেই। কুকরি দিয়ে ঝোপঝাপ কেটে পথ তৈরি করে নিতে হয়। এই পথেই গুপ্তযুগে তৈরি হয়েছিল পুরাতাত্ত্বিক বিস্ময়, নদীর ধারে নলরাজার দুর্গ। ঘন জঙ্গলের ঘেরাটোপে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা। জঙ্গলে আলো ঢোকে না। জোরালো আলোর টর্চ জ্বেলে যেতে হয় জঙ্গলের গভীরে। প্রহরীরা সতর্ক। যে-কোনও মুহূর্তে হিংস্র বন্যপ্রাণী-ঘেরা এই জায়গায় ঘটে যেতে পারে বিপদ। তাই বেশি না এগনোই ভাল। জঙ্গলের ভিতরে কাঠের তৈরি বিলাসকুঞ্জ সত্যিই অসাধারণ। সাজানো বাগানের চারপাশে জানা-অজানা নানারঙের ফুলের মেলা।

এই ক'টা দিন দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারে ভাসিয়ে দেওয়া যায় নিজেকে। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই জায়গা যেন মেঘলোকের এক দেশ!

ফোটো: লেখক



অমিল খোঁজো তফাত বোঝো





উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তপনবাবু দেখলেন, তাঁর বাগানে কলাগাছের উপর বিশাল আকৃতির এক হনুমান বসে আছে। তপনবাবুর তিনটে বাড়ি পরেই থাকেন অপরেশবাবু। তিনি পাকা শিকারি। হনুমান তাড়ানোর জন্য ফোন করে তাঁকে ডেকে পাঠালেন তপনবাবু। কিছুক্ষণ পরেই অপরেশবাবু একটা বুলডগ আর বন্দুক নিয়ে চলে এলেন তপনবাবুর বাড়িতে। কীভাবে হনুমানটিকে তাড়াবেন তিনি, তা জিজ্ঞেস করতে অপরেশবাবু বললেন, "প্রথমে আমি গাছে উঠব। উঠেই হনুমানটাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেব। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার কুকুর টুঁটি চেপে ধরবে ওর।" তারপর তপনবাবুর হাতে বন্দুকটা দিয়ে বললেন, "আমি এবার গাছে উঠব। দরকার হলে আপনি বন্দুকটা চালাতে পারবেন তো?"

"তা চালাতে পারব, কিন্তু বন্দুকটা আমার হাতে দিলেন কেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন তপনবাবু।

"তার কারণ, যদি ঠিক উলটো ঘটনাটা ঘটে, তা হলে বন্দুকটা ব্যবহার করতে হবে আপনাকে," অপরেশবাবু জানালেন।

"ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না," অবাক হলেন তপনবাবু।

"আসলে, গাছে ওঠার পর যদি হনুমানটাই আমাকে নীচে ফেলে দেয় তখন কুকুরটাকে গুলি করবেন আপনি," বললেন অপরেশবাবু।

খুনের আসামির বিচার চলছে আদালতে। খুন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিটির লাশ খুঁজে পাওয়া না গেলেও তাকে যে খুন করা হয়েছে, তাতে কারও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই খুনিকে ধরে ফেলেছে পুলিশ। আর সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণও তার বিরুদ্ধেই। মক্কেলকে কিছুতেই বাঁচানো যাচ্ছে না দেখে উকিলবাবু জজসাহেব ও জুরি মেম্বারদের বললেন, "যাঁকে খুন করার অভিযোগে আমার মক্কেলকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে, তিনি এখনও জীবিত রয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি আদালত চত্বরে এসে উপস্থিত হবেন। আপনারা সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে থাকুন।" একথা বলামাত্র জজসাহেব সমেত প্রত্যেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আদালতে ঢোকার দরজার দিকে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরও এল না কেউ। তখন উকিলবাবু বললেন, "আমরা যখন খুন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিটি ফিরে আসতে পারেন এই ভেবে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তখন ওই ব্যক্তিটি বেঁচে আছেন কি না সে ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত নই। সুতরাং আমরা আসামিকে সাজা দিতে পারি না।"

"কিন্তু," জজসাহেব বললেন, "আমরা সবাই সেই অপেক্ষায় ছিলাম ঠিকই, তবে আসামি তাকিয়ে ছিলেন অন্য দিকে।"

অর্থ শেখো

মনে হতেই পারে শব্দগুলো শোনা। কারণ, কথা বলার সময় আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করি। এগুলোর অর্থও জানি। কিন্তু জানা শব্দ হলেও অনেক সময় সঠিক অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয়। নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে।

ইস্তফা: (১) চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, (২) বরখাস্ত করা, (৩) পদত্যাগ, (৪) চাকরি চলে যাওয়া।

আহাম্মক: (১) অজ্ঞ, (২) হঠকারী, (৩) হাবা, (৪) নির্বোধ।

কালেভদ্রে: (১) সহসা, (২) কালে-কালে, (৩) কদাচিৎ, (৪) পরবর্তীকালে।

হাপুস: (১) শোকার্ত, (২) অশ্রুপূর্ণ, (৩) কাতর, (৪) করুণ।

বেঘোরে: (১) ভীষণ নিরুপায় বা সংকটময় অবস্থায়, (২) উন্মত্ত অবস্থায়, (৩) অসুবিধেজনক বা অস্বস্তিকর অবস্থায়, (৪) বার্ধক্যজনিত দুরবস্থায়।

গত সংখ্যার উত্তর

কেওকেটা: (১) তুচ্ছ। সোজা কথায়, যেমন-তেমন। যেমন, 'আমাদের জমিদারমশাই বড় কেওকেটা নন।' (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

রাজবাট: (৪) রাজপথ। যেমন, 'শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী ভিখারি।' (রবীন্দ্রনাথ)

শ্রুতিধর: (৪) কোনও কথা শুনেই যে মনে রাখতে পারে। যেমন, 'সেকালে আমি কোনও শিক্ষার ধার ধারতুম না, — এ-বিষয়ে আমি ছিলুম শ্রুতিধর।' (প্রমথ চৌধুরী)

বল্লভ: (৩) প্রিয়। যেমন, 'রাইনের মাছ সুস্বাদু, কিন্তু বাঙালি-বল্লভ ইলিশ?' (সৈয়দ মুজতবা আলি)

কসরত: (২) অভ্যাস। এর মূলগত অর্থ হল নিয়মিত ব্যায়াম কৌশল। অভ্যাস, যা বেশ কষ্টসাধ্য। যেমন, 'সারাদিন এমন হিন্দি কসরত করে এমন গলদঘর্ম হতে হয়।' (শিবরাম চক্রবর্তী)

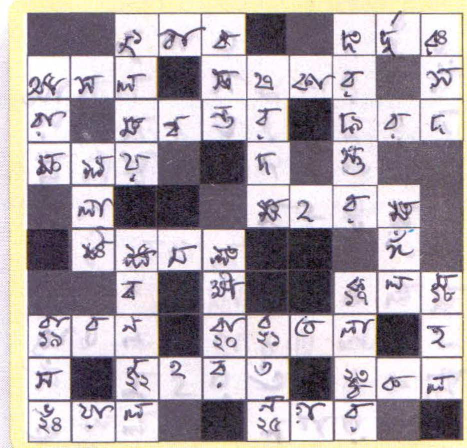
স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) বৃদ্ধ লোকটির বাঁ হাত দেখা যাচ্ছে না। (২) লোকটির চাদর লম্বায় একটু খাটো। (৩) ছেলেটির জামার কলারের রং আলাদা। (৪) বাঁ দিকের একটি নৌকোর অংশ দেখা যাচ্ছে না। (৫) বাঁ দিকের জমিতে পাথরের পাশে ঘাস নেই। (৬) নৌকোয় একজন লোক কম। (৭) দূরে, মাটির রং আলাদা। (৮) ঝোপের কিছুটা অংশ কম।

সংকেত: পাশাপাশি

(১) প্রশ্নের উত্তর। (৩) ব্যাং, ভেক। (৫) খাঁটি, অবিকৃত, ভেজাল নেই এমন। (৬) আমগাছ। (৮) দুর্ভিক্ষ। (৯) সমবেদনা, মমতা। (১০) দক্ষিণা বাতাস। (১২) মুসলমানদের পালনীয় শোকপর্ববিশেষ। (১৪) আলগা হয়ে বা নড়তে-নড়তে পড়ে যাবে এমন অবস্থা। (১৭) লেখনী, যা দিয়ে লেখা হয়। (১৯) রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত লঙ্কার রাজা, দশানন। (২০) জ্যোতিষ মতে দিনের যে অংশে যাত্রা বা শুভ কাজ নিষিদ্ধ। (২২) দামি মণিমাণিক্য। (২৩) পরিশ্রম বা খাটুনির চাপ। (২৪) ভয়ানক, ভয়াবহ। (২৫) বড় শহর।



সংকেত: উপর-নীচ

(১) জলে পরিপূর্ণ। (২) শীতের পরে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস জুড়ে যে ঋতু আসে, —জাগ্রত দ্বারে। (৩) সঠিক দাম ঠিক করার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার কথাবার্তা। (৪) খোরাক, সৈন্যদের জন্য বরাদ্দ খাবার। (৫) সুখ, আয়েশ। (৭) প্রায়ই, ঘনঘন। (১১) কপাল, ভাগ্য। (১৩) শুভ, কল্যাণ। (১৫) সমুদ্রের এই জল বিন্দুমাত্র মুখে দেওয়া যায় না। (১৬) বৃহস্পতিবার। (১৭) চন্দ্র। (১৮) বাসভবন, বাসভবনের অংশ। (১৯) গাধা। (২১) করহ যতন লাভ হইবে—, খুব দামি মণিমুক্তা।

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

		অ	নু	মা	ন		প্র	বা	হ
জ	ন্মা	ন্ধ		তা			ণা		র
জ্ঞা		কা	লি	মা		আ	ম	র	ণ
ল	হ	র		তি	ল	ক			
	জ		জ			ব	স	ন	
	ম	শা	ল			র		চ্ছা	
			পা	ঠ	ক		গ	র	ম
ব	ড়	দি	ন		বি	দু	র		ঞ্জু
দ		নে			রা		রা	খা	ল
ন	রে	শ		ভো	জ	বা	জি		


ছোটদের সঙ্গে নীল

গানে-গানে লক্ষ্মীছানারা

'আকাশ বাংলা'য় গত তিন বছর ধরো টানা চলছে লক্ষ্মীছানাদের আসর। ভাগ্যক্রমে ১৫০ তম এপিসোড পড়েছে ষষ্ঠীর দিনে, তাই সেটে রয়েছে ঢাকি, কলাবউ আর ধুতি পরা নীলকাকু! স্পেশ্যাল এপিসোডে ডাকা হবে ১৫ জন কুচোকাঁচাদের। নিজের লেখা গান গাইতে হবে। আর, তা যদি হয় খাসা, তা হলে প্রথম তিনজন পাবে পুরস্কার। অনুষ্ঠানের পরিচালক অনুপম প্রামাণিক জানালেন, এর আগে বর্ধমান ও হলদিয়াতেও শুটিং হয়েছে। তবে আউটডোরের নানা অসুবিধের জন্যে আপাতত শুটিং হয় সল্ট লেকের বনবিতানে। তুমুল বৃষ্টিতেও ছাতা মাথায় শুটিং চলছে লক্ষ্মীছানার। শুটিংয়ের আগের মুহূর্তে অল্পস্বল্প রিহার্সালও দিয়ে নেওয়া হয়। এত যখন তোড়জোড়, তা হলে অনুষ্ঠানের চাহিদা নিশ্চয়ই আছে? উপস্থাপক নীল্ জানালেন, লক্ষ্মীছানায় মুখ দেখাতে হলে আবেদন করতে হয় আকাশ বাংলার দপ্তরে। এত চিঠি আসে যে, এ-বছরের পয়লা অক্টোবর আবেদন করলে ডাক পাওয়া যাবে আগামী বছরের অক্টোবরে! আপাতত, ৯ অক্টোবর দুপুর বারোটায় দেখানো হবে স্পেশ্যাল এপিসোডটা! পুজোর সময় পুজোর আমেজ! এই তো চাই!

ছুটি-ছুটি খেলা

সারাদিন কাজে ব্যস্ত মা, আর পড়ার বোঝায় নাজেহাল তাঁর ছোট্ট ছেলেটি! মায়ের সঙ্গে থাকা মানেই তো পড়া, আর তা না হলে বকুনি। খেলাটা মাঝখান থেকে মাটি! কিন্তু মা আর ছেলের সম্পর্ক কি শুধুই শাসনের? তাদের মধ্যে নানা বোঝাপড়ার সঙ্গে রয়েছে গভীর ভালবাসা, যা সময়মতো ব্যক্ত করা হয়। সেই না বলা অনুভূতি কাজে লাগিয়ে মায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে হবে 'মম তুম অউর হাম'। এই খেলার প্রথম রাউন্ডে রয়েছে 'কমিউনিকেশন' অর্থাৎ যোগাযোগ। মা ও ছেলে/মেয়ের বোঝাপড়া যত ভাল হয়, ততই বেড়ে যায় তাদের জেতার সুযোগ। দ্বিতীয় রাউন্ডের নাম 'বাজ়র' এবং তৃতীয় রাউন্ডে, লুকনো গুপ্তধনের খুঁজে বের করতে হবে। মম তুম অউর হাম-এর প্রোজোযনা করেছে সিনার্জি কমিউনিকেশন। 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' করে এখন দেশ জোড়া খ্যাতি এদের। সিনার্জির অন্যতম কর্ণধার অনিতা কউল বসু জানালেন, বর্তমান যুগের ছোট পরিবারগুলোর প্রধান অসুবিধে পরস্পরকে সময় দেওয়া। সময় নেই, তাই একে-অপরের প্রতি টান থাকলেও তা ব্যক্ত করতে পারে না। এই গেম শো'র প্রধান উদ্দেশ্য মা ও তাঁর ছেলেমেয়েকে (১০ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে) একসঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেওয়া। ৩০০টি টিম থেকে ৩২টি টিম বেছে নেওয়া হয়েছে। ৫২ এপিসোডের এই খেলা শুরু হয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বর রাত আটটা থেকে। জ্যাকপট পুরস্কার হিসেবে পাওয়া যাবে পরিবারের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ। কলকাতার ছোটরা নিরাশ হোয়ো না, এই মজার খেলায় মায়ের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবে তোমরাও, তবে কয়েকদিন পরে।


'মম তু অউর হাম'-এর সঞ্চালক শ্রুতি শেঠ (ছবি বাঁ দিকে)

মোহনা চৌধুরী

নানা রঙের রামধনু

ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে রামোজি ফিল্ম সিটি

১৯৯৬ সালে দর্শকদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় রামোজি ফিল্ম সিটির। তারপর থেকে অসংখ্য প্রোডিউসার, পরিচালক কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন এই জায়গায়। টিভি প্রোডাকশন, অ্যাড ফিল্ম, মিউজিক ভিডিও— সব ক্ষেত্রেই রামোজি ফিল্ম সিটির অবদান অনস্বীকার্য। আর এজন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফিল্ম স্টুডিও কমপ্লেক্স হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এ স্থান পেয়েছে রামোজি ফিল্ম সিটির নাম।



সানফিস্ট-এর নতুন বিস্কুট

বিস্কুটের জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে আই টি সি লিমিটেড-এর ফুড ডিভিশন। এই সংস্থা বাজারে এনেছে সানফিস্ট গোল্ডেন বেকস আর স্ন্যাকি। এগুলো হল পুষ্টিকর, মনভোলানো সব বিস্কুটের সম্ভার। মাখন, কাজু, মধু ইত্যাদি দিয়ে তৈরি এই সব বিস্কুট এককথায় অসাধারণ। আলাদা-আলাদা স্বাদ আর বিভিন্ন ওজনের প্যাকেটের জন্য দাম ছ'টাকা থেকে শুরু করে ১৩ টাকা। অল্পদিনের মধ্যেই যে সবার মন জয় করে নেবে এগুলো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।



কলকাতায় লিলিপুট

কলকাতায় এল 'লিলিপুট' ব্র্যান্ড। আলিপুরের 'দ্য এনক্লেভ'-এ আনন্দ চিলড্রেন ওয়্যারে খুলল এদের প্রথম দোকান। মোট তিনটি রেঞ্জে সদ্যোজাত থেকে ১১ বছর পর্যন্ত ছেলে এবং মেয়েদের জন্য রয়েছে ট্রেন্ডি সব পোশাক। দাম শুরু ২৯৫ টাকা থেকে। পুজো স্পেশ্যাল অফার হিসেবে, ১ অক্টোবর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি ১,৫০০ টাকায় ২৪৫ টাকার, ২,৫০০ টাকায় ৪৯৫ টাকার এবং ৫,০০০ টাকায় ৯৯৫ টাকার জিনিস ফ্রি পাওয়া যাবে।



ফোটো: প্রদীপ আদক

ফানস্কুল ওয়ার্কস্টেশন

পড়াশোনা করা মোটেই মজার ব্যাপার নয়। তবে খেলার ছলে যদি পড়াটা এগিয়ে যায়, ক্ষতি কী? ফানস্কুলের খেলার ভাণ্ডারে রয়েছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পটাটো হেড, বব দ্য বিল্ডার ওয়ার্কস্টেশন, ফিক্স অ্যান্ড লার্নের কাউন্টিং অ্যান্ড ফান, জিওমেট্রিক শেপস! ফিক্স অ্যান্ড লার্নগুলোর দাম ১২৫ টাকা। ওয়ার্কস্টেশনের দাম ৪৭৫ টাকা। খেলনা দিয়ে কত কিছু করা যায়, সেটাই শেখাচ্ছে ফানস্কুল!

ফ্যাশন শেখাবে বার্বি ডল

সাম্প্রতিকতম স্টাইল আর ফ্যাশন কীরকম হওয়া উচিত? এখন থেকে তা শেখা যাবে বার্বি ডল-এর কাছ থেকেই। ১০ থেকে ১২ বছর বয়সি মেয়েদের আন্তর্জাতিক স্তরে ফ্যাশন-সচেতন হওয়ার জন্য বার্বি ডলের বিকল্প খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আর এ-ব্যাপারে বার্বির সঙ্গে রয়েছে চেলসি, নুলি আর ম্যাডিসন। প্রতিটি পুতুলেরই রয়েছে নিজস্ব স্টাইল আর ফ্যাশন। বার্বি আর তার বন্ধুদের ফ্যাশন-জগতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সমস্ত কৃতিত্বই ম্যাটেল টয়েজ় (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর। অসাধারণ এই পুতুলগুলোকে পাওয়া যাবে ভারতবর্ষের যে-কোনও নামী খেলনার দোকানেই।



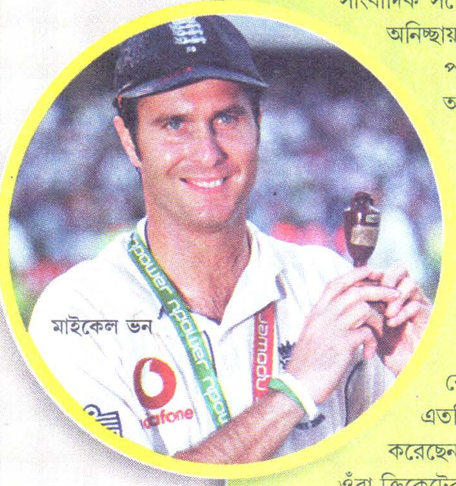


অ্যাসেজ সিরিজ জেতার পর ইংল্যান্ডের ক্রিকেট টিমের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার

অ্যাসেজ থেকে উঠল ফিনিক্স ইংল্যান্ড

শেষ হল 'অ্যাসেজ যুদ্ধ'। ১৮ বছর পর এই মহাযুদ্ধে জয়ী হল ইংল্যান্ড। সেখানে নতুন করে অক্সিজেন পেল ক্রিকেট। এর সঙ্গেই কি শুরু হল অজি সাম্রাজ্যের পতন? লিখেছেন সন্দীপ দাশগুপ্ত

খবরের কাগজে বড় করে ছাপা হয়েছে রিকি পন্টিংয়ের মুখটা। দেখে বেশ মায়াই হচ্ছিল। যেন বক্সিংয়ে হেরেছেন। ম্যাচের এক ঘণ্টা পরের সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে হাজির হতে হয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছায়। একেই বলে অ্যাসেজের মহিমা!



মাইকেল ভন

পন্টিংয়ের মতো 'রংবাজ' ক্রিকেটারও অ্যাসেজ সিরিজে হারটা মেনে নিতে পারছেন না। কারণ এটাকে শুধুই সম্মানের লড়াই বললে বোধ হয় একটু বেশি সুন্দর করে বলা হয়ে যায়। যুদ্ধটা তার চেয়েও তীক্ষ্ণ এবং অনেক অনেক বেশি নিষ্ঠুর।

পাশাপাশি মাইকেল ভনদের দেখে মনে হচ্ছে ওঁরা যুদ্ধ লড়তে গেছিলেন, প্রায় দু' যুগ ধরে শত্রুপক্ষ দখল নিয়ে রেখেছিল তাঁদের কোনও হকের জমি, এতদিনে সেটা উদ্ধার হয়েছে। আর যাঁরা উদ্ধার করেছেন তাঁরা জাতীয় বীর। অ্যাসেজ তো নয় যেন ওঁরা ক্রিকেটের বিশ্বকাপটাই জিতেছেন।

ক্রিকেটের কোনও মহাকাব্যের অস্তিত্ব যদি থাকে, তবে তা অ্যাসেজ সিরিজ। যতদিন খেলাটা থাকবে, ততদিন অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ডের ব্যাট-বলের যুদ্ধ শেষ হওয়ার নয়। সেই ১৮৮২ সালের ওভালের ম্যাচটা থেকে যার সূচনা। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেল ইংল্যান্ড! তা-ও কোন ইংল্যান্ড? যে দলের সম্পদ কিংবদন্তি ডব্লিউ জি গ্রেস। সেদিন উপনিবেশের স্বজাতিদের কাছে হারকে ধরা হয়েছিল জাতীয় শোকের মতো কোনও ব্যাপার। যে হার সম্পর্কে বলা হয়েছিল, ইংলিশ ক্রিকেটের মৃত্যু হয়েছে, শেষকৃত্যে তা শেষ হয় না। ক্ষতবিক্ষত ব্রিটিশ অহঙ্কার তার কল্পনায় দেখতে পায়, শবদেহের অবশেষ এক মুঠো ছাই কোনও পুঁচকে কলসে পাড়ি দিচ্ছে গোলার্ধের একেবারে তলার দিকে থাকা কোনও ভূখণ্ডে।

কিন্তু আসলে তো মৃত্যু নয়। আসলে সেটা জন্ম। ক্রিকেটের অনির্বাণ এক যুদ্ধের। ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে যা চিরন্তন বিনোদন। আজও। চিরন্তন বলেই এক-একটা অ্যাসেজ সিরিজ মহাকাব্যের এক-একটা খণ্ডের মতো। যেমন বডিলাইন সিরিজ। সেই কবেকার কথা। কিন্তু যে-কোনও সময় যে কোনও ক্রিকেটপ্রেমীর কানে একবার না একবার আসবেই। জার্ডিনের ইংল্যান্ডের সঙ্গে লড়াই ব্রাডম্যানদের। সেই প্রথম

শর্টপিচ বলকে অস্ত্র করে ক্রিকেট হচ্ছে। লোপ্পা ক্যাচ ধরার জন্য লেগ সাইডে গাদাগুচ্ছের ফিল্ডার। ক্রিকেট দুনিয়ায় বিতর্কের ঝড়। সবাই ছিন্নভিন্ন অস্ট্রেলিয়ার জন্য দুঃখিত। যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছিল এই ভয়ংকর স্ট্র্যাটেজি সেই জার্ডিন কিন্তু নির্বিকার। বলছেন, "ছ' হাজার মাইল ঘুরে এখানে বন্ধুত্ব পাতাতে আসিনি। এসেছি অ্যাসেজ জিততে।"

ব্যাপারটা এমন জায়গায় গেল, শর্টপিচ রুখতে আইন বানাতে হল। অ্যাসেজ সিরিজকে ঘিরে ঘটে যাওয়া এই সব ঘটনা কিন্তু কোনওদিন পুরনো হয় না। মনে হয় আমরাও নিজের চোখে দেখছি। ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে-মনে ক্যাসেট। শুধু রিওয়াইন্ড করে নাও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে গিয়ে ইংল্যান্ডকে কচুকাটা করছে অস্ট্রেলীয়রা। 'বুড়ো' ব্রাডম্যানের নেতৃত্বে। জীবনের শেষ সিরিজে সেই চার রানের জন্য ডনের টেস্টে গড় ১০০ হল না — তাও তো অ্যাসেজেই! সেই একাশির হেডিংলে। ইয়ান বথামের টেস্ট। ২২৭ রানে পিছিয়ে থাকা ইংল্যান্ড ফলোঅন করেছে আর শেষ তিনজনকে নিয়ে এক অসম যুদ্ধে বথাম। নিজে ১৪৯ নট আউট। গ্রাহাম ডিলে, ক্রিস ওল্ড আর বব উইলিশকে নিয়ে বথাম ইংল্যান্ডকে ১৩০ রানে এগিয়ে দিলেন। ফলোঅনের দিন ইংল্যান্ডের পক্ষে বাজির দর ছিল ৫০০-১। লুকিয়ে সেখানে কিছু টাকা লাগিয়েছিলেন ডেনিস লিলি, রডনি মার্শ। আশ্চর্যের ব্যাপার, টেস্ট জিতে গেল ইংল্যান্ডই। উইলিশের মার-মার বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়া শেষ ১১১ রানে।

এমন কত 'কালেক্টর্স আইটেম'। গত শতাব্দীর আটের দশক থেকে শুরু অস্ট্রেলিয়ার একাধিপত্য। স্টিভ ওয়ের শেষ অ্যাসেজ। এবং অবশ্যই অজি-শাসন কাঁপিয়ে দেওয়া দু' হাজার পাঁচের যুদ্ধ। যার শেষ দৃশ্যে পন্টিংয়ের ঝুলে যাওয়া চোয়াল। জনসমুদ্রে ভন, ফ্লিন্টফ, পিটারসেনরা।

অথচ লর্ডসে ঠিকঠাকই শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। প্রথম টেস্টে ২৪৯ রানে জয় ঠিকঠাক শুরুই বটে। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টেই নাটকীয় লড়াই। অ্যাসেজের ইতিহাসে সবচেয়ে কম রানে (২ রান) টেস্ট জিতে সিরিজ ১-১ করে দিল ইংল্যান্ড। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে তৃতীয় টেস্টে দেখা গেল এক অচেনা অস্ট্রেলিয়াকে। যেন সিরিজ হারানোর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত এই টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার শেষদিককার ব্যাটসম্যানরা কোনওরকমে বাঁচিয়ে দিলেও ট্রেন্টব্রিজে শেষরক্ষা হল না। ফলোঅন করলেন পন্টিংরা। অ্যাসেজের ১৯১টি ম্যাচের ইতিহাসে এই প্রথম ফলোঅন করে হেরে গেল অস্ট্রেলিয়া। এবং শেষ টেস্ট ড্র। ১৮ বছর পর অ্যাসেজ ইংল্যান্ডের।

সিরিজে ছড়ানো মণিমুক্তো-অন্ধকার। এমন এক যুদ্ধ আরও উপভোগ্য হতে পারত গ্লেন ম্যাকগ্রাকে পুরো সিরিজ পাওয়া গেলে। সেটা হয়নি। বিশ্বসেরা দুই দেশ লড়ছে অথচ পরের পর ক্যাচ পড়ছে — ভাবাই যায় না। খারাপ উইকেটকিপিংয়ে পাল্লা দিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট আর ইংরেজ জেরিয়ান্ট জোন্স। তবু এই সিরিজ যাঁরা আগাগোড়া দেখলেন তাঁরা এক কথায় মানছেন, এটা জীবনের অন্যতম সেরা ক্রিকেট-অভিজ্ঞতা। রিচি বেনোর মতো লোক তো একেবারে স্টেপ আউট করে বলছেন, এত ভাল অ্যাসেজ তিনি আর দেখেননি।

কিন্তু কোথায় ভাল? ফ্লিন্টফের খেলায় ইয়ান বথামকে ছাপিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতে? শেন ওয়ার্ন উইকেট নেওয়ার অবিশ্বাস্য মাইলস্টোনে পৌঁছে যাওয়ায়? পন্টিং-ভনের হুঙ্কার এবং পালটা গর্জনে তৈরি হওয়া পরিবেশে? জোন্স-স্ট্রসদের উঠে আসায়? দক্ষিণ আফ্রিকা জাত পিটারসেনের দু'দলে তফাত গড়ে দেওয়ায়?

মনে হয় না, এ সবের কোনও একটার জন্য এ বারের অ্যাসেজ সিরিজ স্মরণীয় হবে। না, অস্ট্রেলিয়ার সিংহাসন টলে যাওয়াটাও একমাত্র ঘটনা নয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ক্রিকেটের আঁতুড় ঘর ইংল্যান্ডের পুনরুত্থান, যেখানে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা পৌঁছেছিল তলানিতে, নায়ক খুঁজতে জেরবার অবস্থা ক্রিকেটপ্রেমীর। সব ভিড় প্রিমিয়ার লিগে। ডেভিড বেকহ্যাম আর রুনি-আওয়েনের জন্য যাবতীয় আবেগ — যেখানে ক্রিকেট আর কোনওদিন ঘুরে দাঁড়াবে ভাবাই যাচ্ছিল না। সেখানে হঠাৎই সব ওলটপালট। ওভালে, সিরিজের শেষ দিন মানুষ যেন তার হারিয়ে যাওয়া আবেগকে পেয়ে পাগল-পাগল অবস্থায়। ক্রিকেট নিয়ে লন্ডনের পাব-এ মাতামাতি কতদিন দেখেনি ইংল্যান্ড! বা ফুটবল স্টাইলে ক্রিকেট মাঠে সমবেত সঙ্গীত! ও দিকে 'ফ্রেডি' 'ফ্রেডি' চিৎকারে কানে তালা। ফ্রেডি হলেন ফ্লিন্টফ নামক নয়নের মণি। শুধু ফ্রেডি নয়, গোটা টিমটাই এখন নয়নের মণি। কারণ, ক্রিকেট নিয়ে ইংরেজ অহঙ্কার ফিরিয়ে দিয়েছে ভন অ্যান্ড কোং। ইয়ান চ্যাপেল তাকাচ্ছেন আরও সামনে। অবশ্য অজিদের ভবিষ্যৎ ভেবে। বলছেন, "জানি না ম্যাকগ্রা আর ওয়ার্ন চলে গেলে আমাদের কী হবে!"

ঠিক কবে ম্যাকগ্রা বা ওয়ার্ন খেলা ছাড়বেন তা অবশ্য আমরা জানি না। ওয়ার্ন কিন্তু বলেছিলেন, এটাই শেষ অ্যাসেজ। আবার সিরিজ শেষ হওয়ার পর অন্য সুর বিশ্বসেরা লেগস্পিনারের গলায়। জানাচ্ছেন, আর-একটা অ্যাসেজ খেলতে পারলে ভাল হয়। কেন বলছেন সেটাও পরিষ্কার। জীবনের শেষ অ্যাসেজে হারের স্বাদ নিয়ে বাঁচতে চান না। ম্যাকগ্রাও নিশ্চয়ই একই কথা ভেবেছেন। পরের অ্যাসেজ অস্ট্রেলিয়ায়। হোম সিরিজের সুবিধা নিশ্চয়ই থাকছে। কিন্তু অভিজ্ঞ অজিদের বিরুদ্ধে ফ্লিন্টফ, পিটারসেনরা আরও পরিণত ক্রিকেট খেলতে পারেন। তার উপর সামনেই উপমহাদেশে সিরিজ! যদি ইংল্যান্ড জিতে যায়? পরের অ্যাসেজের কথা ভুলে আপাতত এটা বলতেই হবে, ক্রিকেটের প্রথম সম্রাট ইংল্যান্ড আবার সিংহাসন ফিরে পেয়েছে। রাজ্যাভিষেকও সম্পূর্ণ হবে!



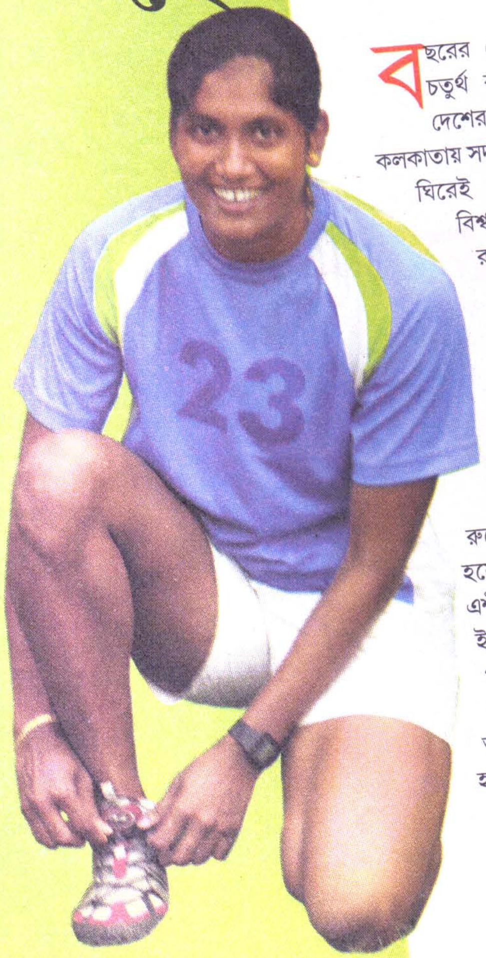
অ্যান্ড্রু ফ্লিন্টফ

অ্যাথলেটিক্স



সম্প্রতি এশীয় অ্যাথলেটিক্সে হেপ্টাথলনে সোনা জিতে ফের ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন সোমা। লিখেছেন চন্দন রুদ্র

হেপ্টাথলনে 'সোনা'র মেয়ে



বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউ এস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছে সানিয়া মির্জা এখন দেশের যুব সমাজের এক নম্বর আইকন। কলকাতায় সদ্য সমাপ্ত সানফিস্ট ওপেনেও সানিয়াকে ঘিরেই ছিল যাবতীয় আকর্ষণ। তবে বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে ৩৪ নম্বর এবং এশীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা এই টেনিস তারকাকে নিয়ে দেশ জুড়ে যত উদ্দীপনা, তার কানাকড়িও নেই অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাসকে নিয়ে। হেপ্টাথলনে সোমা এশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরেছেন। গত বুসান এশিয়াডে ১,৬০০ মিটার রিলেতে সোনা জিতলেও ব্যক্তিগত ইভেন্ট হেপ্টাথলনে রুপো জিতেই সোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিওনে এবারের এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতে বুসানে সোনা না পাওয়ার দুঃখটা অনেকটাই ভুলতে পেরেছেন সোমা। প্রতিযোগিতায় নেমে ৫,৩৭৭ পয়েন্ট তুলে নিয়ে দেশকে সোনা এনে দিয়ে শেষ হাসি হেসেছেন তিনিই।

জ্যোতির্ময়ী শিকদারের মতো নদিয়া জেলারই এক প্রত্যন্ত গ্রাম মণ্ডলপুকুরিয়া থেকে বীরেন ভৌমিকের হাত ধরে সোমার উত্থান। পরে কলকাতার সাই কেন্দ্রে জাতীয় কোচ কুন্তল রায়ের প্রশিক্ষণেই হেপ্টাথলন হয়ে ওঠে সোমার প্রধান ইভেন্ট। কঠিনতম এই ইভেন্টে লড়াই করতে-করতে এশীয় সেরা হয়েও সোমার কোনও স্পনসর নেই। ইউ এস ওপেনে ভাল খেলার জন্য ইতিমধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজশেখর রেড্ডি সানিয়া মির্জার হাতে ২০ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আগামী এক বছর অন্ধ্র সরকার এই হায়দরাবাদি টেনিস তারকার ট্র্যাভেলিং কোচের খরচও বহন করবে।

সেদিক থেকেও সোমা বঞ্চিত। তবু এরই মধ্যে এই লড়াকু মেয়েটি আরও বড় জয়ের স্বপ্ন দেখেছেন। ২০০৩ সালে হায়দরাবাদে প্রথম এশীয়-অ্যাফ্রো গেমসেও হেপ্টাথলনে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সোমা। আগামী বছর মার্চে মেলবোর্নে কমনওয়েল্‌থ গেম্‌সের পরই সেপ্টেম্বরে দোহায় বসবে এশিয়ান গেমসের আসর। ইউরোপ সার্কিটে অংশ নেওয়ার ফলেই সদ্য মোনাকোর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে নেমে লং জাম্পে অঞ্জু ববি জর্জের রুপো জয় সহজ হয়েছে। এ রাজ্যের অ্যাথলেটিক্স কোচেস অ্যাসোসিয়েশন স্পনসর জোগাড় করে ইউরোপ সার্কিটে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আশার আলো দেখছেন সোমাও।

শারাপোভা এবং সানিয়া মির্জার ম্যাচ। তবুও সানিয়ার প্রথম শটেই দর্শকদের উচ্ছ্বাস। লিখেছেন পায়েল সেনগুপ্ত



ফোর হ্যান্ড

গো সানিয়া

গত বছর অর্থাৎ ২০০৪-এর অক্টোবরেও তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল ১৯৩। ইউ এস ওপেনের থার্ড রাউন্ডে মারিয়ন বার্তোলিকে হারানোর পর তাঁর র‍্যাঙ্ক এখন ৩৪। সানিয়া মির্জাকে নিয়ে যাঁরা সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেন, তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তাঁর এই কেরিয়ারগ্রাফই যথেষ্ট নয় কি? ৮ সেপ্টেম্বর একদিকে ছিল সানিয়া-শারাপোভার ম্যাচ, অন্যদিকে ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে ওয়ান-ডে। মিডিয়া এবং ক্রীড়াপ্রেমিকদের সানিয়া-ম্যানিয়া দেখে বোঝার উপায় ছিল না, ক্রিকেট নামের খেলাটির জন্য ভারতীয়দের আদৌ কোনও উন্মাদনা আছে! প্রথম দশে থাকা নাদিয়া পেত্রোভা এবং স্‌ভেতলানা কুজনেৎসোভাকে হারানোর পর তাঁকে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ যে চড়বেই, তাতে আর আশ্চর্য কী! প্রায় আঠারো মাসের মধ্যে ২৬৪ জনকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন সানিয়া। ফোরহ্যান্ডে তাঁর উন্নতি চোখে পড়ার মতো, পাওয়ারফুল গ্রাউন্ডস্ট্রোক তো আছেই। তবুও সানিয়ার সার্ভিসের দুর্বলতা, ফিটনেসের অভাব, আহত হওয়ার প্রবণতা, খেলায় ধারাবাহিকতার অভাব, তাঁকে বিশ্বের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের থেকে এখনও অনেকখানি পিছিয়ে রেখেছে। সানফিস্ট ওপেনে তাঁর পরারফরম্যান্স অন্তত সেকথাই বলছে। কিন্তু মনের জোরে যে-কাউকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন সানিয়া। ফর্ম ধরে রাখা বা খেলায় হার-জিত, এমন কিছু গতানুগতিক ব্যাপার দিয়ে তাঁকে বিচার করাটা বোধ হয় ঠিক নয়। সানিয়া মির্জা শুধু একজন খেলোয়াড় নন, একটা মানসিকতার নাম। সানিয়া বিশ্বাস করেন, প্রত্যেককেই হারানো যায়, তিনি যত বড়ই হোন না কেন! বিশ্বের দু'নম্বরে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে তাঁর টি-শার্টে লেখা থাকে, 'ডোন্ট গেট ইন মাই ওয়ে!', কিংবা 'ইউ ক্যান আইদার এগ্রি উইথ মি অর বি রং'। মারিয়া শারাপোভাই নাকি এখন টেনিস দুনিয়ার এক নম্বর গ্ল্যামার গার্ল। অথচ ফ্লাশিং মেডোয় সানিয়ার জনপ্রিয়তা দেখে সে কথা মনে আসার জো নেই। তাঁর টেনিস-প্রতিভার কথা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন শারাপোভা এবং সেরেনা উইলিয়ামস। টেনিস-লেজেন্ড জন ম্যাকেনরো তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "শি ইজ় ফিয়ারলেস অ্যাবাউট গোয়িং ফর দ্য শট্‌স। শি জাস্ট বিলিভ্‌স অল হার শট্‌স উইল গো অন।" সানিয়া মির্জা নিজেও তাই বলেন নিজের সম্পর্কে, "ঝুঁকি নিতে আমি ভালবাসি, বলে যতটা সম্ভব জোরে আঘাত করি। আমার মনে হয়, আমি যেভাবে খেলি, দর্শকরা তা দেখতে পছন্দ করেন।"

সানিয়ার এই বেপরোয়া মানসিকতাই নজর কেড়েছে কর্পোরেট জগতের মহাজনদের। প্রতি এনডোর্সমেন্টপিছু তিনি নাকি নিচ্ছেন দেড় কোটি টাকা, যেখানে তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছেন একমাত্র সচিন ছাড়া সকলকেই। আর এখানেই ভয় ক্রীড়াপ্রেমীদের। যে মনের জোর নিয়ে সানিয়া মির্জা এক নম্বরে পৌঁছনোর স্বপ্ন দেখতে পারেন, তা যেন টাকার খেলায় নষ্ট না হয়ে যায়!

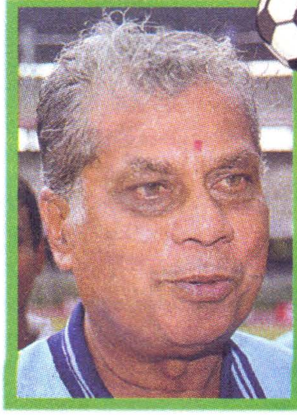


শিক্ষক দিব্যেন্দু বড়ুয়া



বড় আকারের দাবা আকাদেমি গড়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সেটা হয়ে ওঠেনি। তবে বসে না থেকে আপাতত ৩৩বি, হিন্দুস্থান রোডের দু' কামরার ফ্ল্যাটেই ২১ জন খুদে শিক্ষার্থীকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল দিব্যেন্দু বড়ুয়ার দাবা আকাদেমি। ৪ সেপ্টেম্বর ডিস-প্লে বোর্ডে চাল দিয়ে আকাদেমির সূচনা করলেন শহরের মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু পি হরিকৃষ্ণ, সাঁতারু বুলা চৌধুরী। ৪-১৬ বছরের ছেলেমেয়েরা এখানে দাবার খুঁটিনাটি শেখার সুযোগ পাবে। গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সহেলি এবং নীরজ মিশ্র ছোটদের দাবা খেলা শেখাবেন।

সংবাদের শিরোনামে অমল



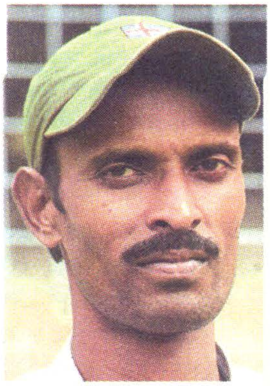
আবার শিরোনামে কোচ অমল দত্ত। তাঁর কোচিংয়ে এবারের লিগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে পর পর দু'বার হারিয়ে লিগ ফুটবলে এখন চালকের আসনে মোহনবাগান। ক্লাব নির্বাচন নিয়ে চাপানউতোর চলার মধ্যেও পর পর জয় তুলে এনে ইয়াও রডরিগে, মেহতাব হোসেনদের ঘিরে সবুজ মেরুন সমর্থকদের আগ্রহ, উচ্ছ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। এই পঁচাত্তর বছর বয়সেও তিনি যেন তারুণ্যের প্রতীক। তাই এই বয়সেও জার্মানি বিশ্বকাপে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি।

৫,০০০-এর ক্লাবে সৌরভ

রানে ফিরেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু রানে ফেরাই নয়, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে বুলাওয়ায় প্রথম টেস্ট জয়ের সঙ্গে বিশ্বের ৬৪তম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৫,০০০ রানের গণ্ডিও পেরিয়ে গেলেন। ১৩টি টেস্ট খেলার পর টিম-ইন্ডিয়ার অধিনায়ক নিজের দ্বাদশতম সেঞ্চুরি দিয়ে রানে ফিরেছেন। এই টেস্টেই ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক টেস্টে (৪৮টি) নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ডও গড়েছেন সৌরভ। গাওস্কর, বিশ্বনাথ, বেঙ্গসরকর, কপিলদেব, আজহারউদ্দিন, তেন্ডুলকর এবং দ্রাবিড়ের পর সৌরভ হলেন অষ্টম ভারতীয় ক্রিকেটার, যিনি টেস্ট ক্রিকেটে ৫,০০০ রানের ক্লাবে ঢুকে পড়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।



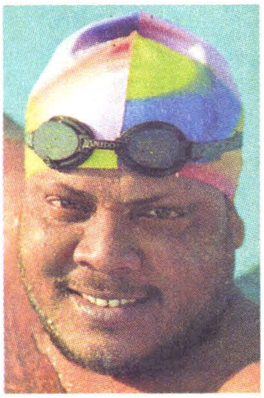
দেশ জয়ের পর এবার বিদেশ



নিউ ইয়র্ক ম্যারাথনে অংশ নিতে আমেরিকা উড়ে যাচ্ছেন খড়্গপুরের আর পি এফ কর্মী বিমল মাহাতো। ৬ নভেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪০ হাজার প্রতিযোগীর সঙ্গে লড়াইয়ে নামবেন ৩৬ বছরের এই রানার। গত ১৩ মার্চ তৃতীয় কলকাতা ম্যারাথনে বিজয়ী বিমল দ্বিতীয় কলকাতা ম্যারাথনেও চ্যাম্পিয়ন হন। প্রতিদিন ৪০-৫০ কিমি দৌড় অনুশীলন করেন তিনি। অ্যাথলেটিক্স কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সি আই আই প্রতিযোগিতা শুরু করার ১৫ দিন আগেই বিমলকে নিউ ইয়র্ক পাঠানো হচ্ছে, দেওয়া হয়েছে বিমানে যাতায়াতের টিকিট।

সিনেমায় মাসুদুর

প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে রেখে ইংলিশ চ্যানেল জয় করে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন প্রতিবন্ধী সাঁতারু মাসুদুর রহমান বৈদ্য। পরে জিব্রাল্টার প্রণালীও অতিক্রম করেন তিনি। সেই সাঁতারু মাসুদুর এবার একেবারে অন্য ভূমিকায়। হ্যাঁ, এবার সিনেমায় অভিনয় করছেন তিনি। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'মানবসেবা সংঘ' প্রযোজিত 'আশা' নামের এই ছবিতে ছোটদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন মাসুদুর। গঙ্গায় নেমে ছোটদের ভয় বা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার স্বপ্ন দেখাবেন তিনি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক দফায় শুটিংও হয়েছে। শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনিনির্ভর এই ছবিতে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, দীপঙ্কর দে, লাবণি সরকার এবং রাজ্যের দমকলমন্ত্রী প্রতিম চট্টোপাধ্যায়।



চন্দন রুদ্র

ভাল দই তৈরী করা এখন আর আর্ট নয়।

এখন যে কেউ সেরা দই তৈরী করতে পারে। আপনাকে যেটা করতে হবে, তা হ'লো, সুরক্ষামূলক ছয়-স্তরের প্রলেপযুক্ত কারটন প্যাকের ডবল প্যাসট্যারাইজড় দুধ ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু কারটনের দুধ ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ামুক্ত, তাই আপনি পান এর থেকে তৈরী তাজা, স্মুথ ও গাঢ় দই। আপনার পরিবারের জন্য এটাই সবচাইতে ভাল দুধ। সুগৃহিনী হয়ে, সংসারের হাল ধরতে বেছে নিন কারটনের সেরা দুধ।



ANANDAMELA OCTOBER 2005 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 &
LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06